KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রেজাউল
Title : চতুরঙ্গ	Size 7"x 9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : 46/7 46/8 46/9 46/10	Year of Publication : Nov 1985 Dec 1985 Jan 1986 Feb 1986
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আব্দুর রউফ	Remarks :

I. D. Roll No : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

ডিসেম্বর
১৯৮৫

আশা ছিল : সাতচল্লিশের স্বাধীনতা ভারতবর্ষকে যথাযথ ভাবেই স্বাধীন করে তুলবে, পূর্ববিকশিত হয়ে উঠবে এই উপমহাদেশের নিজস্ব সম্ভাবনা। সেই আশা কি পূর্ণ হচ্ছে? সার্থক হচ্ছে? নাকি, আবার আমরা ফিরে চলেছি আপাদমস্তক ঋণজালে আবদ্ধ পরমুখাপেক্ষী জীবনের হীনতায়? আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্ম কি দেশের এই গভীর সংকট সম্বন্ধে সজাগ? এবং, এই সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করতে তারা কি সক্ষম? এইসব উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন নিয়ে প্রবীণ বিপ্লবী তথা সমাজসেবী পান্নালাল দাশগুপ্তর রচনা **সভ্যতার মহাসংকটের চ্যালেনজ**।

এই বছরে আন্তর্জাতিক নারীদশক পূর্ণ হল। এই প্রেক্ষাপটে অশোক রুদ্র **ভারতীয় সমাজে নারী-পুরুষসম্পর্ক** নিবন্ধে ভারতীয় নারীসমাজের বৃত্তিনির্বাচনের স্বাধীনতা, উচ্চতম শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ, ঘরে-বাইরে সামাজিক-পারিবারিক অবস্থান, ব্যক্তিক স্তরে নারীপুরুষের সখ্য-প্রেম-যৌনতা ইত্যাদি নানান সমস্যার অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ করেছেন। এই নিবন্ধে তিনি দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন, কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে এই সম্পর্ক যথার্থ অর্থে হয়ে উঠতে পারে মানবিক, এবং পরস্পরের জীবনকে দান করতে পারে মহত্ত্ব।

রবীন্দ্র-কবিতার অনুবাদে ইংরাজ কবি উইলিয়ম রাদিচের সাফল্য এবং দুর্বলতার বিশদ আলোচনা করেছেন অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য—**রাদিচের অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ**।
উপন্যাসে সত্য-মিথ্যা তথা বাস্তব-কল্পনার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণ **উপন্যাস কি মিথ্যার শিল্প?** প্রবন্ধে : বিশ্লেষক প্রখ্যাত লাতিন-আমেরিকান ঔপন্যাসিক মারিয়া ভারগাস লোলসা।

নানা প্রসঙ্গ বিভাগে আলোচিত : এজরা পাউনডের জন্মশতবর্ষ ; এ বছরের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপক সিমোঁর সাহিত্যকৃতি ; বহুজাতিক তুলা-কোমপানিগুলির বিরুদ্ধে অনমনীয় যোদ্ধা ডাকতার ওলি হ্যানসনের লড়াইয়ের কথা ; ঢাকা দূরদর্শনের দুটি মর্মস্পর্শী নাটকের সানুরাগ পরিচিতি আধুনিক 'দলিত' মারাঠি কবিতার বিবরণ।

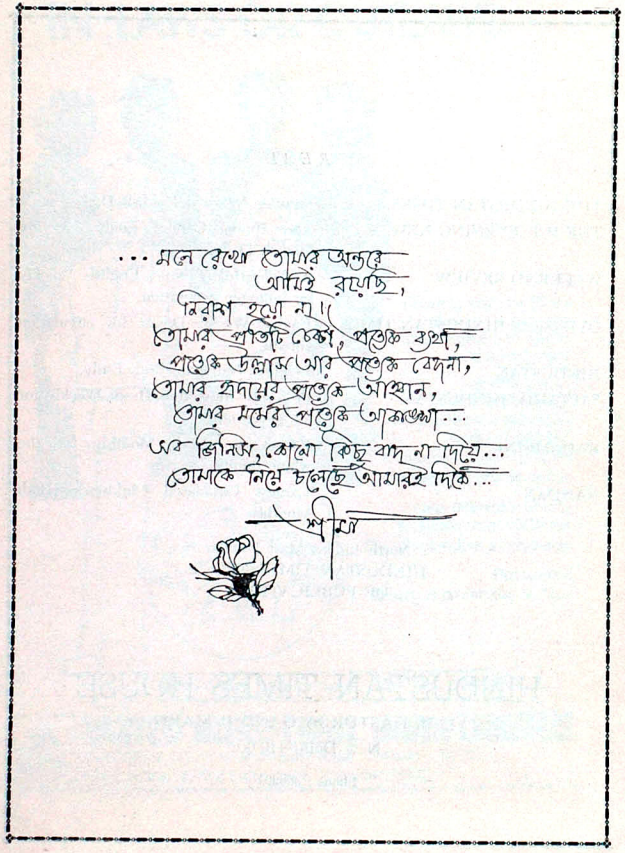

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শীমা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৪৬। সংখ্যা ৮
ডিসেম্বর ১৯৮৫
অগ্রহায়ণ ১৩৯২

সভ্যতার মহাসংকটের চ্যালেনজ পান্নালাল দাশগুপ্ত ৬২৫
ভারতীয় সমাজে নারী-পুরুষসম্পর্ক অশোক রুদ্র ৬৪৪
রাদিচের অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতি ভট্টাচার্য ৬৬৪
উপন্যাস কি মিথ্যার শিল্প? মারিয়ো ভারগাস লোলসা ৬৭৮

সানাকির আলুনি, লাবণ্য নিখিলকুমার নন্দী ৬৩১
চান্দীপুরে : সমুদ্রপ্রতিমা মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৬৩২
বিজয়িনী পর্বতে শীত এল মঞ্জুভাষ মিত্র ৬৩৩
এ কোন্ যন্ত্রণা দিলে সুব্রত সেন ৬৩৪
স্মরণে দয়াময়ী মজুমদার ৬৩৫

এখানে অন্ধকার কানাই কুণ্ডু ৬৩৬
পোকামাকড়ের ঘরবসতি সেলিনা হোসেন ৬৫৬
অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৬৭১

গ্রন্থসমালোচনা ৬৮৩
সুকুমারী ভট্টাচার্য, সুধীর চক্রবর্তী, ইন্দিরা দেবী

ঢাকার চিঠি সৈয়দ আবুল মকসুদ ৬৮৭

আলোচনা ৬৯০
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, বর্ণালী দাস

নানা প্রসঙ্গ ৬৯৭
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, শুভাশিস মৈত্র,
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর মৈত্র

মুখপাতের ছবি। কমলকুমার মজুমদার
শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

RAHUL COMMERCE PVT. LTD.

Eagle House

4 Government Place North, Calcutta-700 001

Tel : 22-2094 Telex : 02 2670

Dealers for Eastern India

For

APPLE

COMPUTERS

স্কেচ। কমলকুমার মজুমদার

সভ্যতার মহাসংকটের চ্যালেনজ

পান্নালাল দাশগুপ্ত

১৫ই অগসট স্বাধীনতাদিবস উপলক্ষে আমাকে কয়েক জায়গা থেকে আমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত এসব উৎসবে বা সভাতে আমি যাই না। এবারের একটি অনুষ্ঠানে আমাকে বাধ্য হয়ে যোগ দিতে হয়েছিল, কেননা উদ্যোক্তারা আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলেন। তবে একটা শর্ত ছিল—আমাকে যেন কোনো 'বক্তৃতা' দিতে না হয়। শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনও ১৫ই অগসট। ওই অনুষ্ঠানে শ্রীঅরবিন্দের একটা মূর্তি উন্মোচনের ভার আমার উপরে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার মুখ থেকে দুয়েকটি কথা শুনবেনই—এমন দাবি কিছু শ্রোতার কাছ থেকে আসে। উদ্যোক্তারাও তার সুযোগ নিয়ে আমাকে কিছু বলতে বলেন। বাধ্য হয়ে সংক্ষেপে দু-চারটা কথা বলি।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার বলার কিছু অধিকার থাকলেও আমি কেন তাতে অনীহা প্রকাশ করি, এটা অনেকের কাছেই একটা প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার বলে মনে করি। তাই আজ কলম নিয়ে বসেছি।

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগসট যে 'স্বাধীনতা' আমরা পেলাম তার মূল্য দেওয়া হয়েছিল অনেক সাম্প্রদায়িক খুন আর দাঙ্গাহাঙ্গামা দিয়ে, এবং দেশ-ভাগে রাজি হয়ে। সেদিনকার সেই স্বাধীনতাদিবসে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত দিল্লির মহোৎসবে যান নি। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন—এ কিসের উৎসব! বরং তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা শহরের শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য এখানেই থেকে গেলেন, এবং ওই দিনটি উপবাস আর প্রার্থনায় কাটালেন। শেষ পর্যন্ত মহাত্মা কেন দেশভাগ মেনেছিলেন, সে বিতর্কে এখন যাব না। তবে সেদিন তিনি এটুকুই মাত্র বলে নিজেকে আর দেশবাসীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন যে, "পাকিস্তান অন্তত সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে ভালো!" অর্থাৎ বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদী শাসনের বদলে যদি দেশ-ভাগ-করা পাকিস্তানই আসে, তা মেনে নিয়েই অগ্রসর হও, কী আর করা যাবে! অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—এজাতীয় সান্ত্বনা বলা যেতে পারে।

কিন্তু কোনো-কোনো বিষয় আছে, যা ভাগ করলে বা টুকরো করলে তার সে চরিত্র, গুণ বা মূল্যই থাকে না। স্বাধীনতা তেমনি একটা জিনিস। 'শান্তি' বা বিশ্বশান্তিও তেমনি একটা জিনিস। যা কিছুই মহৎ, তাদের স্বরূপ এক-রকম। এজন্য বলা হয়, শান্তি, স্বাধীনতা—এসব অবিভাজ্য। বিভাজ্য স্বাধী-নতা বা আংশিক স্বাধীনতা বা আংশিক শান্তি যে শেষ পর্যন্ত তাদের স্বরূপেই বিকৃতি আনে, সে তো আমরা গত ৩৮ বছরে স্বাধীন ভারত আর স্বাধীন পাকিস্তানের ইতিহাসেই দেখলাম! আজ মনে হয়, ১৯৪৭-৪৮ সালে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে যে একটা স্লোগান শহরবন্দরের পথেঘাটে উঠত, এবং

যেসব দল আর নেতা তা বক্তৃতার মঞ্চ থেকে প্রচার করতেন, কাগজেকলমে লিখতেন, তাঁরাও ক্রমে-ক্রমে এই স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছেন। আজ আর কেউ এই স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেন না, বরং এই স্বাধীনতার ফল ভোগ করে থাকেন। রাজ্যসরকারগুলি অবশ্যই অহরহ সীমিত ক্ষমতার অভিযোগ করে থাকেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারও বোঝেন যে তাঁদের ক্ষমতাও সীমিত ; কেবল আর্থিক শক্তির দিক থেকেই নয়, সার্বভৌমত্ব রক্ষার দিক থেকেও। আর্থিক সীমা তো সব স্বাধীন দেশেরই আছে, এমনকি স্বয়ং আমেরিকারও। কিন্তু ভৌগোলিক সীমান্তরক্ষা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে ভারত সরকার, স্বাধীন পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে নানা বাধাবিপত্তি ভোগ করতে হয়, আর এসব বিষয়ে তাদের পরনির্ভরতা বোধহয় অতীতের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়।

তবু, অবশ্য আমাদের ভালো হোক আর মন্দ হোক, উৎসব তো পালন করতেই হবে ; উৎসবের দিনে অত সব কটু, তিক্ত বিষয়ের স্মৃতিচারণ করা ঠিক নয়। উৎসবের একটা নিজস্ব মূল্য আছে—যার একটি হল 'ভুলে যাওয়া'—তিক্ততা ভুলে যাওয়া, নতুন করে জীবনযাপন এবং এগিয়ে চলার উদ্যম সৃষ্টি করা। নিত্যনতুন প্রজন্মের শিশু আর ছেলেমেয়েরা অতীত নিয়ে বসে থাকবে না, আমাদের মতো যাঁরা বৃদ্ধ, তাঁরাই তিক্ত অতীতের কথা ভেবে-ভেবে বিষণ্ণ হয়ে থাকতে পারেন। নতুন প্রজন্মের লক্ষকোটি শিশুসন্ততিনেরা তাদের অন্তর্নিহিত আশাবাদ এবং শক্তি নিয়েই অচিরে বর্তমান এবং বর্তমানের যাবতীয় চ্যালেনজগুলিকে গ্রহণ করে পরম উৎসাহে জীবনসংগ্রামে নেমে পড়বে। তাদের মনকে ভারাক্রান্ত এবং দ্বিধান্বিত করা কি ঠিক?

কিন্তু এইজন্য যদি আমরা চুপ করে থাকি, তাতেও হয়তো আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হয় না। অতত যা দেখেছি, তাতে যা মনে হয়, কিসে কী ঘটে—এ সম্বন্ধে আমাদের জীবনের যা-কিছু অভিজ্ঞতাসঞ্জাত জ্ঞান, তা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বোধহয় বলা দরকার। এবং অনেক ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রে না হলেও, তারা সেটা আমাদের কাছ থেকে শুনতে চায়, বুঝতে চায়। কেননা তাদের সহজাত বুদ্ধিতেই তারা এটুকু বুঝতে পারছে যে, তাদের 'ভবিষ্যৎ' খুব উজ্জ্বল নয়, তাদের আমরা যে দেশটা দিয়ে যাচ্ছি, তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেনাগ্রস্ত, দায়বদ্ধ ; সমাজে প্রচুর দুর্নীতি, অশান্তি, আর্থনীতিক সংকট এবং বেকারসমস্যা। যদিও কিছু-কিছু ছেলেমেয়ে কারও কাছ থেকে 'জ্ঞান' নিতে প্রস্তুত নয় বলে মনে হয়, তবু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় —তাদের চোখেমুখেও ভয়, অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্ক স্পষ্ট।

১৯৪৭ সালের পর আজ ৩৮ বছর কেটে গিয়েছে। সে তো আজকের কথা নয়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের লোকসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জন্ম নিয়েছে স্বাধীনতার পর। পরাধীন ভারত তারা দেখে নি। পরাধীনতা কাকে বলে, তাও হয়তো বুঝতে পারে না। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সেদিনকার সেই চেহারা তারা জানে না। বাকি এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে যাঁরা এখন প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ, তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন, তেমন মানুষ মুষ্টিমেয়ই জীবিত আছেন। আর প্রতিদিনই তাঁদের সংখ্যাও কমে আসছে। তা ছাড়া, তাঁদের হাতে আজ আর রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব রাখা যায় না, বা স্বাধীন ভারতের কর্ণধার হয়ে থাকা সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে, উচিতও নয় বোধহয়। বার্ধক্য, জরা এবং সাংসারিক অনেক রকমের দায়দায়িত্ব তাঁদের প্রায় অচল করে তুলেছে। কিন্তু তাঁরা যদি সত্যিকার কোনো জীবন্ত ধারা বা বলিষ্ঠ ঐতিহ্য সৃষ্টি করে যেতে পারতেন, তবে ওই ধারা বা ঐতিহ্যই পরবর্তী স্বাধীন প্রজন্মগুলিকে উদ্দীপিত করতে পারত। কিন্তু সেটা হয় নি। কতগুলি উৎসব—স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের নামে প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে কতগুলি অনুষ্ঠান—হয় বটে, কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই প্রাণহীন কতগুলি 'রিচুয়াল' মাত্র। সরকারি নেতৃত্বে আর সরকারি উদ্যমের ভিত্তিতেই সেসব অনুষ্ঠান ঘটে, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী জনসাধারণের সমর্থনে ঘটে না। খবরের কাগজ আর সরকারি বিজ্ঞাপনই তাদের 'জিইয়ে' রাখে। উপরন্তু, সেসব জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি জনসাধারণের কতকটা উপহাস, বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা এবং উদাসীনতায় স্বতঃস্ফূর্ত বা বর্ণাঢ্য হতেই পারে না।

তবে ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশে 'স্বাধীনতা'ই এল, আর কিছু ঘটল না—এটা কিন্তু ঠিক নয়। বহু মূল্যে পাওয়া এই স্বাধীনতা অন্য একটা বৃহত্তর বিপ্লবের দুয়ার খুলে দিল। সেই বৃহত্তর বিপ্লবের অন্তর্গত হল দেশগঠনের উদ্যম। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষ হাত গুটিয়ে নেবার আগে ভারতের কৃষ্টির সীমান্ত সব দিক দিয়ে ভেঙে চুরমার করে গিয়েছে। ভারত হয়ে পড়েছে একটা উন্মুক্ত দেশ বা ওপেন কানট্রি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব ঘটল প্রধানত আমেরিকায়, এবং আমেরিকার নেতৃত্বে সব দেশে দেশে, যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে আর জাপানে, তা ক্রমশ পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতেও আগ্রাসী বিস্তার ঘটাতে লাগল।

ভারত পাকিস্তান প্রভৃতি সব স্বাধীন দেশগুলিই তাদের দারিদ্র্য দূর করার জন্য জোর কদমে নানা পরিকল্পিত উপায়ে দেশগঠনের কাজে হাত দিল। কিন্তু কোন্ মডেলে এই বিকাশ বা ডেভালাপমেনট হবে? সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক, যে মডেলই হোক, অথবা মিশ্র মডেলই হোক, সেই সব মডেলেরই আসল বস্তু বা প্রাণচেতনা হল শিল্পায়ন বা ইনডাসট্রিয়ালাইজেশন। বলা বাহুল্য এশিয়া বা আফ্রিকার পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে আমেরিকা, ইয়োরোপ বা জাপানের দ্বিতীয় শিল্পায়ন তথা সুপার-ইনডাসট্রিয়ালাইজেশনের শক্তিতে এই শিল্পায়ন ঘটানো সম্ভব নয়। ইয়োরোপ-আমেরিকার ফেলে-দেওয়া প্রযুক্তিবিদ্যাকে (প্রথম শিল্পায়নের প্রযুক্তিবিদ্যা) সম্বল করেই তাদের এগোতে হয়। এর ফলে কী হল? সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি অগ্রগামী দেশগুলির চণ্ডে তাদের নকল করতে গিয়ে ক্রমশ নাকাল হয়ে পড়তে লাগল। অগ্রগামী আমেরিকা আর ইয়োরোপ এবং সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য দিন-দিন বেড়েই যেতে লাগল। ফলে, এইসব সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে দেখা দিল সর্বব্যাপী অসন্তোষ। আকাঙ্ক্ষা বা অ্যাসপিরেশনের ক্ষেত্রে যে সীমাহীন বিস্ফোরণ বা বিপ্লব ঘটেছিল, তা সহসা অপ্রতিরোধ্যরূপে এক ঠান্ডা হতাশা বা ফ্রাসট্রেশনে পরিণত হল।

এদিকে স্বাধীনতা-উত্তর-প্রজন্মজাত লক্ষকোটি ছেলেমেয়ে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ইয়োরোপ-আমেরিকার ভোগবাদী বড়্রিপুবর্ধক মডেল এবং পাশ্চাত্য হালচালকে নির্বিবাদে নিজেদের জীবনদর্শন বলে গ্রহণ করল। ভারতীয় ঐতিহ্য বা ভারতের বাণী বলে আর কিছু স্বীকৃতই হল না। ভারতভাগ্যবিধাতা নির্দিষ্ট কোনো জীবনাদর্শ রইল না। যাকে বলে কালচারাল কঙকোয়েসট বাই দি ওয়েসট, তা যেন স্বাধীনতার পরেই সম্পূর্ণ হল। শিক্ষাদীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা এবং অন্যদিকে কলকারখানা যতই বাড়ছে, ততই এই নতুন-নতুন প্রজন্মের শিশু, ছেলেমেয়ে, তরুণ-তরুণী সবাই ভারতীয় বলে বিশেষ যা-কিছু আছে, তা-ই বর্জন করছে। ছেলেরা তো জাতীয় পোশাক-আশাকও আর ব্যবহার করে না, করতে জানে না। পোশাক জিনিসটা তুচ্ছ নয়, সামান্য নয়। পোশাক-আশাকের মধ্য দিয়েই একটা জাতির কালচার এবং জীবনভঙ্গি প্রকাশ পায়। যেমন সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন সন্ন্যাসীর চরিত্রকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি হাল ফ্যাশনের স্যুট-বুট পোশাক-আশাকও নওজোয়ানদের চরিত্র অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত করে। কেবল পোশাক-আশাকই নয়, খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা, গানবাজনা ইত্যাদির ব্যাপারেও আজ আমরা ইংরেজ বা সাহেবদের এতটা অনুকরণ করছি, এবং অনুকরণ করে গর্ব অনুভব করছি যে, হয়তো কারও-কারও কাছে—অন্তত আমাদের মতো পুরানো জমানার মানুষদের চোখে —তা লজ্জার বিষয় হয়ে পড়ে।

ভোগবাদী সভ্যতাকেই সভ্যতা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' কথাটা হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যবরণ—'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান—এজাতীয় উক্তি স্বয়ং নজরুলের হলেও এই প্রজন্মের কাছে হাস্যকর। তবে এই দরিদ্র দেশে, যেখানে শতকরা সত্তরটি মানুষ দুবেলা খেতে পায় না, সেখানকার নিরন্ন মানুষ যদি এ-জাতীয় উক্তিকে উপহাস করত, তারা যদি বিদ্রোহ করত, তাহলে তা নিশ্চয়ই ন্যায়সংগত বলে মনে করতাম। কিন্তু তা নয়। তারা মোটা ভাতকাপড় পেয়ে বাঁচতে চায় মাত্র। মনে রাখতে হবে, নজরুল ভাববিলাস করেন নি। তিনিও প্রচণ্ড অর্থকষ্টে ভুগেছেন বাল্যকাল থেকেই। তিনি যা বলেছেন, তা নিজের উপলব্ধি থেকেই বলেছেন। তাই উক্তিটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যাই হোক, প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যারা আজ প্রচণ্ড দাপটে ভোগবাদের মহিমা কীর্তন করে বেড়াচ্ছে, তারা দারিদ্র্যপীড়িত নয় ; উপরতলার পনেরো শতাংশ কি বিশ শতাংশ মানুষের মুখেই নজরুলের উক্তিটি নিয়ে উপহাসের কথা শোনা যায়। অর্থের পেছনে ছোটাই পরমার্থ এই প্রজন্মের কাছে। এবং এই 'শিক্ষিত' উচ্চমধ্যবিত্তরাই

দেশের সংবাদপত্র, বিদ্যালয়, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি দখল করে আছেন বলে নীচের তলার অতিদরিদ্র লোকদের মাথাও তাঁরা খেয়ে বসেছেন। আজ দেশের উপর থেকে নীচে পর্যন্ত একটা বিকৃত ভোগলিপ্সা সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে। এই ভোগলিপ্সা আর আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য মানুষ যে-কোনো দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করছে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বাড়িয়ে ফেলার ফলে দুর্নীতি সর্বস্তরে দেশটাকে ছেয়ে ফেলেছে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কেউ-কেউ একথা বুঝলেও জাতিকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন না, কেননা লোভ দেখিয়ে, প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতির প্রতিযোগিতায় ভোট তাঁদের সংগ্রহ করতেই হবে যে! ফলে, দুষ্টকে দুষ্ট বলার সাহস তাঁদের নেই। ভালো মন্দ সকল লোকের মূল্য এই রাজনৈতিক দল আর নেতাদের কাছে একই, কেননা সকলেরই তো একটা করে ভোট আছে, সে চোরই হোক আর সাধুই হোক। এইভাবে আমাদের গণতন্ত্র বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা কোথায় যে চলেছি —'ঝড়ের বেগেতে চলেছি কোথায় এ যাত্রা'—থামতে তো কেউ বলছেন না।

ইংরেজকে সশরীরে এদেশ থেকে আমরা তাড়িয়েছি বটে, কিন্তু "পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!!" সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ছিল দুর্বল। আর আজ পৃথিবীর যাবতীয় সাম্রাজ্যবাদ মালটিন্যাশনাল বাণিজ্যের রূপ ধরে, বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থ-সাহায্যের নামে এই স্বাধীন ভারতকে আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রাস করে ফেলেছে। স্বেচ্ছায় পরমুখাপেক্ষী, পরাধীন বা পরনির্ভর হতে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদেরই আজ কী উৎসাহ! আমাদের দেশের নয়া পণ্ডিতকুলের কী বিদ্যাবত্তার বিস্ফোরণ! অর্থনীতিবিদ তথা প্ল্যানারদের কী জাদুকরী যুক্তি! আর এরই উপর নির্ভর করে দেশ-রক্ষার জন্য বিপুল প্রস্তুতি এবং অর্থের অপচয় করা হচ্ছে—অথচ দেশ যেন দিনকে দিন বিপন্নই হচ্ছে। আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বেপরোয়া সন্ত্রাসবাদ, খুনোখুনি, যার ফলে কোনো নেতা বা ব্যক্তির জীবনই আজ নিরাপদ নয়। অহিংসার দেশে হিংসা যেন সহস্র-মুখী হয়ে চারদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা বিস্তার করে চলেছে। পথেঘাটে এধানে সেখানে নানা কুটিল ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি সবাই, কেউ কাউকে আর বিশ্বাস করতেই পারছে না। এমনকি নিজেদের দেহরক্ষীদেরও বিশ্বাস করতে পারা যাচ্ছে না।

এ-সমস্তই ইউরো-আমেরিকান সভ্যতা অনুসরণ করার ফল। আমার চোখে নতুন প্রজন্মের—স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের—লক্ষলক্ষ কোটিকোটি সন্তানসন্ততিদের হাতেই দেশ আজ নতুন করে পরাধীন হতে চলেছে। হাই-টেক কনজিউমারিজমের মধ্য দিয়ে এই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাই আমাদের দেশের আত্মিক পরাভব ঘটিয়ে ছাড়ছে। আজ ভারতবর্ষ কোথায়, ভারতমাতাই বা কোথায়? দি আইডিয়া অব ইনডিয়া হ্যাজ উইদার্ড অ্যাওয়ে! গান্ধীজী বলতেন, এবং অনেকেই বলেছেন, ইনডিয়া লিভস ইন ভিলেজেস। কিন্তু আজ ভারতের গ্রামদেশেও সেই ভারত বা ভারতীয় সত্তাকে বা তার আইডেনটিটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা, আজ যাঁরা গ্রামোন্নয়নের জন্য কাজ করেন তাঁদের সবারই লক্ষ্য হল গ্রামগুলিকে শহর বানিয়ে ফেলা। সরকারি উদ্যোগেই হোক, পঞ্চায়েত উদ্যোগেই হোক, কিংবা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির উদ্যোগেই হোক, এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি সকলেরই এক।

অথচ গান্ধীজি এক সময় বলেছিলেন, ভারতের গ্রাম-গুলিই যদি ধ্বংস হয়ে যায়, বা তাদের নিজস্ব স্বনির্ভর চরিত্র এবং বিশেষ জীবনাদর্শকে বর্জন করে, তবে ভারতবর্ষেরই আর বিশেষ কোনো পরিচয় থাকবে না। কিন্তু আজ কে শোনে, কে বিচার করে ভারতীয় সভ্যতা এবং গ্রামদেশের ভূমিকা সম্পর্কে গান্ধীজি আর রবীন্দ্র-নাথের কথা? আজ ছেলেমেয়েরা এক বিকৃত নেশায় মাতাল হয়ে লাফাচ্ছে। একজন জাপানি চিন্তাবিদের ভাষাতেই বলি,

"The young people are just dancing now, but some day they will have to face the music."

এবং সেদিন খুব দূরে নেই। কিন্তু সংবিৎ যখন ফিরে আসবে, তখন হয়তো আর সময়ই থাকবে না, 'মহতী বিনষ্টি' ঘটে যাবে। যদ্‌বংশ ধ্বংসের জন্য চালু হয়ে যাবে মুষলপর্ব।

স্বাধীন ভারতের দিক থেকে এই বিশ্বব্যাপী সুপার-ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের আগ্রাসী চিত্রটা তো দেখলাম। ইউরোপ, আমেরিকা এবং উন্নত দেশগুলিতে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের আবর্তে পৃথিবীব্যাপী যে একটা বৃহত্তর মহাবিপ্লব ঘটে যাচ্ছে, তার মধ্যে আমরা অজানতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। ফলে দেশের সীমান্তরক্ষা বা ভৌগোলিক রাজনৈতিক সীমানাগুলি অবান্তর বা ইরেলিভ্যানট হয়ে গেল। এই সীমান্তরক্ষা করা আজ পারমাণবিক যন্ত্রপাতি দিয়েও সম্ভব নয়, সীমান্তগুলি আজ মানুষের গলায় ফাঁসির রশি! প্রতিরক্ষার দিক থেকে হিমালয় বা ভারত মহাসাগর ভারতকে আত্মরক্ষায় কোনো সাহায্য করে না। কেননা আজ উন্নত, শক্তিমান দেশগুলির হাতে যে-ধরনের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র মজুত রয়েছে, তাতে হিমালয় বা ভারতমহাসাগর কোনো বাধাই নয়। পাহাড় পর্বত সমুদ্র মুহূর্তে অতিক্রম করে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের সাধের সব নগরনগরী ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব। পাকিস্তান আর বাংলাদেশের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভারতকে পশ্চিম আর পূর্ব দিক থেকেও দুর্বল করে রেখেছে। দেশভাগ করে স্বাধীনতালাভের এই পরিণাম! নিজেদের পৈতৃক দেশের মধ্যেই দেশকে বিপন্ন করার জন্য নানা প্রতিকূল সীমান্ত—বৈরী সীমান্ত—রচনা করা হয়েছে। আর এদিকে বৃহৎ শক্তিরা পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, নক্ষত্রযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সর্বদাই এক মহাযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে! এবং আমরা—স্বাধীন ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নয়া শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত—বিশ্বব্যাপী চক্রচক্রান্তে 'স্বেচ্ছায়' অংশীদার হতে বাধ্য হয়েছি! এও পশ্চিমী দানবিক সভ্যতার একটা অপরিহার্য দিক।

আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, জারমানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন—এরাও কি খুব স্বাধীন আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে? দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের জাদুকরী কীর্তি-কলাপ এবং ধ্বংসকাণ্ডকে যুক্তিসম্মত বলে প্রতিপন্ন করার খাতিরে তৈরি মতবাদের অসীম ক্ষমতাই কি আজ তাদেরও বিপন্ন, আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে না? আজ কোনো দেশের সীমান্তই কি সেই দেশকে রক্ষা করতে পারে? অল বাউনডারিজ আর নাউ ইরেলিভ্যানট, ইকনমিক্যালি, পোলিটিক্যালি, মিলিটারিলি অ্যানড কাল-চারালি। এ সব সীমান্তই আজ অ্যানাক্রনিজম-এ পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু ভারতীয়, পাকিস্তানি আর বাংলা-দেশি নয়া-ধনী, নয়া-বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রছাত্রীমহল, সাহিত্যসেবীর দল এসব যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না।

আজকে দেখছি, সারা পৃথিবীর সব দেশে নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ মূর্ত হয়ে উঠছে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপারটি হল, যতই মানুষ বাইরের দিক থেকে কাছে আসছে, অবস্থানের দিক থেকে ঘনীভূত হচ্ছে, ততই যেন মানসিক দিক থেকে মানুষে-মানুষে বিচ্ছিন্নতাবোধ আর অনৈক্য বেড়ে চলেছে। গোটা পৃথিবীটা বাহ্যিক দিক থেকে একটিমাত্র ছোট্ট জনপদ হয়ে পড়লেও মনের দিক থেকে তার অধিবাসীরা প্রত্যেকেই যেন হয়ে পড়ছে একাকী, সঙ্গিহীন, অসহায়। প্রেম ভালোবাসা আত্মীয়তাবোধ দুর্লভ জিনিস হয়ে উঠেছে। আবার এই সার্বিক বিচ্ছিন্নতাবোধ কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কাউকেই, কোনো জাতি বা উপজাতিকেই, এই সর্বগ্রাসী সভ্যতার বেড়া ভেঙে ফেলতে দিচ্ছে না। এই দেশের মধ্যে, ভারতের মতো নানাভাষী নানাধর্মাবলম্বী জনবহুল দেশেই যে কেবল বিচ্ছিন্নতাবোধ ফেটে পড়তে চাইছে তাই নয়; গ্রেট ব্রিটেন, জারমানি, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি 'শক্তিমান' দেশগুলিতেও এই রোগের বিস্তারই ঘটছে। অপর দিকে আমরা দেখছি, মানুষ আজ পৃথিবীর পরিবেষ্টনের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবার জন্য, মহাকাশ করতলগত করার জন্য, সমুদ্রতল জয় করার জন্য দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে অভিযানে নেমেছে, এমনকি মহা-কাশে মানুষের ভাসমান উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্নও দেখছে। আবার নক্ষত্রযুদ্ধের সরনজাম নিয়ে মহাকাশ থেকে পৃথিবীটাকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হচ্ছে। পৃথিবীর আকাশ বাতাস জল ইতিমধ্যে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে সভ্যতার আগ্রাসী তাড়নায়। মানবতার জীবজন্তু এবং বনজ সম্পদ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারতের নতুন প্রজন্ম সোৎসাহে এসব নেশা রপ্ত করে চলেছে। 'ভারত-তীর্থ'-জাতীয় কোনো দৃষ্টিভঙ্গিকেই স্বীকার করছে না। অপর দিকে, সুপার-ইনডাস্ট্রিয়াল পশ্চিমী অগ্র-গামী দেশ এবং জাপান নিজেদের রাশ সামলাতে পারছে না। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার পিছিয়ে-পড়া দেশগুলি থেকে সরে গিয়ে নিজেদের ভৌগোলিক সীমা-নার মধ্যে তারাও স্বর্গসুখে বাস করতে পারছে না।

সর্বদিক থেকেই দেখছি একটা অদ্ভুত প্যারাডকস সৃষ্টি হয়েছে। এই প্যারাডকস আর স্ববিরোধ একই

সঙ্গে মানুষের দুরন্ত ভবিষ্যৎ এবং মহতী বিনষ্টি উপস্থিত করেছে।

এযুগের এই ভয়াবহ দ্বন্দ্ব বা কনট্রাডিকশনসগুলির একটা সিনথেসিস বা মহৎ সমন্বয় সম্ভব, যদি সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষকে নিয়ে একটা গঠনমূলক পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিন্তু সেই ওয়ার্ল্ড প্ল্যান কেবল আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনা এবং বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির আরও বিকাশের উপর নির্ভর করে না। টেকনলজির সমস্যা এটা নয়—আসল সমস্যা মানবিকতা বা হিউম্যানিজমের পুনরুদ্ধার। এই হিউম্যানিজম কিন্তু কোনো 'মতবাদ' নয়। প্রত্যেক ধর্মে, প্রত্যেক মতবাদে, প্রত্যেকের জীবনে এবং প্রত্যেক সমাজে সর্বকালে এই সহজাত মানবপ্রীতি বর্তমান। কোনো মতবাদের পরিণতি এটা নয়—সকল মতবাদের অন্তর্নিহিত প্রাণ।

যত জ্ঞানবিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে, তাই আমরা সামাল দিতে পারছি না। উলটে, এসব জ্ঞানবিজ্ঞান আমাদের আগ্রাসী এবং লোভী চেতনাকে উগ্র থেকে উগ্রতর করে আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনছে যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক বীভৎসতা, সন্ত্রাসবাদ, দুর্নীতি আর ষণ্ডামিতে। মুক্তি রয়েছো আরও প্রযুক্তিতে নয়, আরও অ্যাডভেনচারে নয়, মুক্তি রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটানোর মধ্যে। দৃষ্টিভঙ্গি যদি পালটায়, তবে দেখা যাবে মানুষের শক্তির অসামান্যতা। তা যে মানবসভ্যতার আত্মহত্যা ডেকে আনবে, তা নয়।

ব্যাপারটা একই সঙ্গে এত কঠিন আবার এত সহজ! যত বড়ো চ্যালেনজ, তত বড়োই তার সম্ভাবনা। এই সর্বনাশের সার্বিক চ্যালেনজের মোকাবিলা করার জন্য চাই নতুন দর্শন, নতুন জীবনভঙ্গি বা দৃষ্টিভঙ্গি। যুগে-যুগে মহাপুরুষেরা যত প্রেম আর মুক্তির পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, তাদের কোনোটাই বর্জন করার দরকার হবে না, বরং আজই সেসব সার্থক এবং পূর্ণরূপায়িত করার সম্ভাবনা উপস্থিত। এভাবে যদি দেখি, তবে ভারততীর্থের পথ অপথ বা বিপথ বলে মনে হবে না, ভারততীর্থ মানবতীর্থে সকলকে সমবেত করবে। সসাগরা জীবধাত্রী পৃথিবীতে মানুষের একটিই দেশ হতে পারে যেখানে ক্ষুদ্র জাতীয়তা, প্রান্তীয়তা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণীশোষণ, শ্রেণীসংগ্রাম, বর্ণবিদ্বেষ, নারী-পুরুষে অধিকারের দ্বন্দ্ব—সবকিছুরই মীমাংসা হওয়া এবং করা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারলেই বোঝা যাবে যে, ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম ব্যর্থ বা অর্থহীন হয় নি, সর্বকালের সকল মানুষের মুক্তির পথে তা একটি অবশ্যম্ভাবী পদক্ষেপ ছিল মাত্র। কিন্তু সেই পদক্ষেপটিই শেষ পদক্ষেপ নয়। মানবমুক্তির অনন্ত যাত্রাপথে ইদানীং এই উপমহাদেশে তা প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। আমেরিকা, জাপান, জারমানি, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ দ্বিতীয়যুদ্ধোত্তর যুগে যে-দ্বিতীয় শিল্পায়ন উপস্থিত করে যুগান্তকারী ভূমিকা নিয়েছে, সেটাও তাদের শেষ পদক্ষেপ নয়। পৃথিবীর সকল দেশকে এখনই আরও কয়েক পা ফেলতে হবে ধীর মস্তিষ্কে অসিধারার উপর দিয়ে, নইলে কারও পক্ষেই মহতী বিনষ্টির হাত থেকে মুক্তি নেই। একদিকে যেমন নানা প্যারাডক্স সৃষ্টি হয়েছে, অপরদিকে ঘনীভূত হয়ে এসেছে একটা দুর্দমনীয় বাধ্যবাধকতা বা কমপালশন।

দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়েই নানা দেশের নানা মানুষ এযাবৎ মনুষ্যসভ্যতার একটা বনিয়াদ গড়ে তুলেছে। কিন্তু আগে দেশ এবং জাতি-সমূহের মধ্যে ব্যবধান ছিল বৃহৎ, যার ফলে আস্তে-ধীরে কতকটা বিচার বিবেচনা করেই এই দেওয়া নেওয়ার বিবর্তনটা চলছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব আর যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে জাতিতে-জাতিতে কোনো আপাতদূরত্ব রইল না। সবাই যেন সমস্ত সীমান্ত ভেঙেচুরে একটা ছোটো জনপদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে শেষ অবধি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। যুগপৎ অভ্যন্তর্মুখীন আর বহির্মুখীন এই বিরুদ্ধ গতিবেগ মানুষদের দিশাহারা করে ফেলেছে। পশ্চিম থেকে পূর্ব কী নেবে, পূর্ব থেকে পশ্চিম কী নিতে পারে—এসব বিষয় শান্তভাবে বিচার বিবেচনা করারও যেন সময় নেই। ভালোমন্দজ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে অন্ধ আকুতি থেকে সৃষ্ট হচ্ছে নানা ধরনের অন্ধসংগ্রাম, পরিস্থিতি বিপজ্জনকভাবে তেতে উঠেছে। এই দিগ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা পরিস্থিতি থেকে কী করে মুক্তি পাওয়া যায়, সেটাই আজ সকল দেশের সকল মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেনজ।

সান্‌কির আলুনি, লাবণ্য

নিখিলকুমার নন্দী

হাঁ-করা বিবরে গেছে সবটাই ;
পেষণ-শোষণ ছিল সবিরাম অবিরাম সবিকার নির্বিকার ঢেউ
কুমিরের হাঙরের ;
যতক্ষণ শ্বাস আহা ততক্ষণ আশ ছলছলানির
আশ্লেষে এসেছিল মীনকন্যা অথচ আপ্লুত সুনিবিড়

নোঙর ছিঁড়েছে পালতোলা নৌকো তারপর জাহাজের ভোঁ
শুনেছি পেয়েছে হালে জলের চালাকি ছলবলে অনুকূল
চপল তারল্যে ঘোর ভুলে গেছে তটস্থতা বৃক্ষের বীজন
সেও একদিন ছিল খরতালে অশ্রুমুখী ছায়ার কাঙাল!

আজ আর কোনো দেখা নেই ;
আকুল হারিয়ে গেছে অকূল ব্যসনে
বাসনা কত কী করে দুরাকাঙ্ক্ষা নিকট ভাসায়
দূরকে কাছির টানে সরতে-সরতে মুচড়ে হেসে ওঠে

সুশ্রী শুধু বিশ্রী হয় কালস্রোতে? অ-ভাবে স্বভাব বদলায় :
খ'সে পড়ে নীবিবন্ধ, খুলে ওড়ে সাপটা আঁচল
বুঝি-বা পতাকা তাই, হয়তো সে পালের মেজাজে
বাতাসকে অনুরূপ কাছে আনে তরতরিয়ে ত'রে যাবে, অপূর্ব তরণী!

যে-দীপ নিভেছে ঘরে দাউদাউ জ্বালায় চারপাশ
রক্তিম আকাশে কত অভিনব মনোহর ছবি ফোটে সান্দ্র সান্ধ্য নেশা
লাগে নেশা
শনশন ছোটে নৌকো ছিমছাম বঙ্গোপসাগরে
আর দূর দূর নয় আকণ্ঠ লাবণ্য হো হো উচ্ছ্বাস ফসফরাস উৎসব
ডিস্‌কোনাচ শোর
এতকাল নদীনাব্যে ছিল যা তা সান্‌কির আলুনি, ঢিমে লন্ঠন, টিমটিমে
দিনরাতভোর!

চান্দীপুরে : সমুদ্র-প্রতিমা

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

তোমার বুকের মধ্যে মুখ রাখলে শ্বাসকষ্ট হয়
এত হাওয়া পূর্বসমুদ্রের থেকে উড়ে আসে যদি
ঝাউগুলি দিবা সয় বরং খুশিতে মাথা নাড়ে—
আমি কবে ঝাউগাছ হব? তুমি সমুদ্র হয়েছ!

কলকাতার অকসিজেন বিমুখ জীবনে, বাসে ট্রামে
যাবতীয় কারবন-কনটেনট, তাই ফুসফুস ছোটো—
ইঁদুরের মতো কিছু মানুষমানুষী হেঁটে যায়
সেখানে আটপৌরে তুমি এত বড়ো সমুদ্রপ্রতিমা।

তীরে বসে থাকে পাখি সাবলীল হেলাফেলা নিয়ে
ওদের মস্তিষ্ক নেই—কণিষ্ক কাঁকড়াও ঠিক তাই
ঝিনুকের বুকের ভিতরে রাখা মাংসখণ্ড খায়—
তখন রোদ্দুর কাঁদে সমুদ্রের বুকে মুখ গুঁজে!

তোমার বুকের মধ্যে মুখ রাখলে শ্বাসকষ্ট হয়—
অথচ পিছিয়ে যায় ক্রমাগত মৃত্যুর সময়।

বিজয়িনী পর্বতে শীত এল

মঞ্জুভাষ মিত্র

পশমে জড়ানো রাত্রি পার্শ্ববর্তিনী নারী ঘুমের ভিতর
মৃদুকণ্ঠে অকস্মাৎ বলে উঠল : বিজয়িনী পর্বতে শীত এল
এবং তখনি মোমবাতি নিভে গেল পূর্ব বছরের দীর্ঘ স্মৃতিগুলি
যত তন্ময় ড্যাফোডিল ও ব্যাঘ্রলিলি যেন যাওয়ার জন্য ব্যগ্র প্রস্তুত
হেসে উঠল ক্ষীণস্বরে, গান করল আকাশে উঠে সুগন্ধ সাবান
শীতবেলা এল বুঝি? অতি রমণীয় শীত ফুরাতে চায় না
সাতশ পাতার কলাপূর্ণ উপন্যাসের মতো, ভিতরে-ভিতরে নায়িকার
স্তন ও কটি চন্দ্রবিধৌত রাতে ফলের মতো আঁকড়ে ধরে কামনার
শাশ্বত বাদুড় আমাদের দীর্ঘশ্বাস, স্পর্শ আর দর্শনের স্বৈত বিক্রম
ধীরে প্রকাশিত হয় ; আয়নার বুকে জমে সোনালি বরফ
অর্ধকর্তিত আপেল, গোলাপের প্রচণ্ড কুণ্ডি, ভাজে-ভাজে ছাড়ানো পেঁয়াজ
প্রতিবিম্বিত হয় আর উষ্ণতার কোমল প্রহারে আর্তনাদময়
নারী বলে ওঠে : হে অনপেক্ষিত সময়ের ধাবমান ধারালো বরফ
আমাকে ছুঁয়ো না তুমি এক্ষনি এই রাতে, আমার ভিতর
বহু উষ্ণ গল্প উপন্যাস আছে, বীজের মতন তারা ডানা নাড়ছে
হেসে ওঠে প্রতিধ্বনি, ভ্রান্ত জীবনদর্শন এবং গ্রন্থে নিবন্ধ তৃষ্ণা
আর এই স্থূল অবকাশে বিজয়িনী পর্বতে চন্দ্র অতন্দ্র নভে
উড়ে যায় কামনার শাশ্বত বাদুড় . . .

এ কোন্ যন্ত্রণা দিলে

সুব্রত সেন

এ কোন্ যন্ত্রণা দিলে, আবেশে সিক্ত হয় দুপুর
রাতের পথ নেই বারবার ঘুরে
মৃত্যুর পরোয়ানা এড়াতে এখানে ভেসে থাকা
এত মায়া! মায়ায় ভুলেছি পথ
গতিরুদ্ধ স্থির সংগমে সন্তর্পণে পা ফেলা
এ কোন্ যন্ত্রণা দিলে!

কতদিন পা বাড়াই নি বাহিরপানে
চোখ তুলে দেখি নি সারাদিন সূর্যের রক্ত গমনরথ
কতদিন সামুদ্রিক বালি মাখি নি চুলে
বড়ো সুখে আছি বলে ঘরদোর তুলে দিতে সাধ হয়।
সাধ্য নেই ; বড়ো জটিল আবর্তচক্রে
শুধু দুটি ব্যথা নিয়ে ভেসে আছি
এত মায়া! আমার আপন জন মায়ার ভিতরে আছে
মায়ার ভিতরে আছে যাবতীয় সুখশান্তি,
ঘরের আশা, কখনো মনকষাকষি
কখনো তোমার প্রেমে দুইফোঁটা জল
মায়ার আবর্তে আছে মিলেমিশে, একাকার
যন্ত্রণা আছে। মায়ারই মধ্যে আছে মৃত্যুপরোয়ানা
মায়ার আকরে আছে মরণের সুখ—

এ কোন্ যন্ত্রণা দিলে!

স্মরণে

দয়াময়ী মজুমদার

শূন্যতার গভীরে...জীবনের অন্য নামে ভিন্ন চোখে
কখন আবার আমি যেন দেখি :
সূর্যাস্তের ক্লান্ত পারাবারে শ্রান্ত দিগন্ত, আসন্ন প্রতীক্ষা সন্ধ্যার
বিষণ্ণতা নামে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব ঘিরে।
স্তব্ধ অপলক নিঃশব্দ একটি বেদনা, কত শান্ত কত যেন মায়া
শ্যাম-স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ এ নীরবতা—পরিপূর্ণ,
নির্বাণের হেমরাত্রি গম্ভীর এখানে, মৃত্যুহীন রাগিণী এক উদাস সংগীতে
ধরণীর এপাশে তারই কিছু রিমঝিম
ভেসে আসে স্মরণের আলাপে ; তবু কী ভীষণ এ নীরবতা
তবুও হয়তো সত্য একথা—
'বাবু...নীল...অভিমানী...সুন্দর...প্রজাপতি...'এ স্তব্ধতা!

এখানে অন্ধকার

কানাই কুণ্ডু

না, এখানে কেউ আসবেন না, এখানে অন্ধকার—গভীর গহন অন্ধকার। অন্ধকারেই আমার নীরব অস্তিত্ব, ঘোরাফেরা, অনুভূতি এবং চেতনা। আমার অসুবিধা নেই, সয়ে গেছে অন্ধকারে মিশে-থাকা, ভেসে-থাকা। আমার ক্ষোভ নেই, ভয় নেই, কান্না নেই, হতাশা নেই। আমার কান্না ক্ষোভ হতাশা আশা আনন্দ ছিল—এখন নেই, অন্ধকারে লীন। শুধু আমি আছি, আছি কিন্তু অদৃশ্য, অস্পৃশ্য। চেতনায় আছি, স্মৃতিতে আছি। স্মৃতি শব্দটা বড়ো একা, ভীষণ একা। আমার স্মৃতি আমারই, আমার মতো বোবা এবং স্থবির। আমি ছাড়া তার নড়াচড়া নেই, বেঁচেথাকা নেই, অস্তিত্বও নেই। আমি স্মৃতিকে কবর থেকে খুঁড়ে তুলি। স্মৃতি কি দুঃখবাহী? সুখের স্মৃতি, সাফল্যের স্মৃতিও আমাকে রক্তাক্ত করে। কিন্তু স্মৃতি ছাড়া তো আমার কেউ নেই, কিছু করার নেই। স্মৃতিকে বুকে রাখি, চোখে মাখি, লোফালুফি করি। স্মৃতি তখন ঝিমঝিম শব্দে কথা বলে, আমাকে ছোঁয়, ছবি আঁকে। আমার পুরোনো আমিকে দেখতে পাই, এই যেমন এখন দেখতে পাচ্ছি—আমার পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো আমিটা তেজি ঘোড়ার মতো ঘাড় ফুলিয়ে বসে আছে। পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সভা। পাশের চেয়ারে পার্টির প্রাদেশিক প্রেসিডেনট সুধন্য সেন, ওপাশে পার্টি সেক্রেটারি অলোক ঘোষ। বাঘা-বাঘা কমরেডরা উপস্থিত। পার্টির গতিপ্রকৃতি, ওঠাপড়া, ভ্রান্তি এবং সাফল্য সম্পর্কে পার্টি লাইন দ্বিধাগ্রস্ত। এখন চুলচেরা হিসেব, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং নিরপেক্ষ মতামত জ্ঞাপন। প্রত্যেকে নিজস্ব বক্তব্য রাখছেন। রাশিয়ার শোধনবাদী সাম্রাজ্যবাদ, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লববাদ ইত্যাদি কলহের দোটানায় পার্টির ভাঙন অবশ্যম্ভাবী। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো প্রবর্তনে, নেতিবাচক আন্দোলনের ব্যর্থতায় এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দাবিতে সদস্যেরা মুখর। এই প্রসঙ্গে পঁয়ত্রিশ বছরের তরুণ আমিটা সেদিন অনেক চোখা শব্দে বক্তব্য রেখেছিল। প্রেসিডেনট সুধন্য সেন আমার বক্তব্যে ক্ষুণ্ণ হলেও, আমাকে বুকে জড়িয়ে বলেছিলেন, তোমার বক্তব্যে আমি একমত না হলেও, তোমার বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রশংসা করি।

ঠিক তার দেড় মাস পরেই পার্টি বিভক্ত হল। নতুন

বিপ্লবী পার্টি জন্মলাভ করল। আমি নবগঠিত পার্টির আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হলাম।

অজস্র করতালির শব্দ এবং আলিঙ্গনের মালা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি মানে কলকাতার শহরতলি, জীর্ণ পৈতৃক একতলা খসেপড়া সুরকির দেয়াল, ফাঁকে শ্যাওলার সবুজ। পাশেই একটা মজা ডোবা, ডোবায় কচুরিপানা, বেগুনি ফুল এবং ফুলে কিছু ফড়িঙের অহেতুক ঘুরপাক, বর্ষায় ব্যাঙের ডাক। আমার পড়াশোনা, কাজকর্মের মাঝে আমার বাড়ি, আমার ভাই-বোন, বিধবা মা। মা কিছুদিন আগেই গত হয়েছেন। আমার সাফল্য তিনি দেখে যান নি। সাফল্য অবশ্য বৈষয়িক নয়, পার্টিভিত্তিক। মা আমাকে পছন্দ করতেন না। আমি নাকি চিরকাল অকর্মণ্য। ছাত্রাবস্থায় ভবিষ্যৎ নামের স্বপ্নিল জগৎকে জলাঞ্জলি দিয়েছি—চায়ের ভাঁড়, বিড়ি এবং রাজনীতিতে ক্ষয়িষ্ণু। সংসার অর্থাৎ সংসারের ভাইবোন, বিধবা মায়ের স্বাচ্ছন্দ্যে মনোযোগ ছিল না। চাকরির দরখাস্ত না লিখে, পোসটার লিখি। নিষিদ্ধ রাজনীতির বই পড়ি। পুজোর ফুল না কিনে, লেনিনের ছবি দেয়ালে টাঙাই। 'ছাই হবে, ঘরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে নাটের পত্তন, দেশ উদ্ধার করবে, আসলে আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করছে'—এইসব ছিল আমার সম্পর্কে আমার মায়ের সম্ভাষণ।

মা নিঃশব্দে গত হলেন। মারা যাওয়ার তিনদিন আগে থেকে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ। যদিও ডাক্তার বা চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। বিজিত, অর্থাৎ আমার ছোটো ভাই, নিয়মিত ওষুধ দেওয়া, দেখাশোনা করা, পাশে থাকা ইত্যাদি বিষয়ে তৎপর ছিল। আমি তখন পার্টি প্লেনামে ব্যস্ত। মারা যাওয়ার খবর পেয়ে, পার্টির কিছু তরুণ ক্যাডার নিয়ে দৌড়ে এসেছিলাম। ততক্ষণে অন্তিম যাত্রার আয়োজন সমাপ্ত। ছোটো ভাই বিজিতই সব ক্রিয়াকর্ম করে। লক্ষ করলাম, মা সমস্ত অভিমান তাকে দিয়ে গেছেন। চাপা ক্ষোভে সেও নীরব। এই নীরবতা সে মার মতোই অভ্যেস করে নেয়। নিজের উদ্যোগেই ব্যাঙ্কে একটা চাকরি যোগাড় করে। বাম রাজনীতিকে ঘৃণা করে, ধর্মঘটের দিনে নিষ্ঠাবান কর্মীর মতো কাজে যোগ দেয়, কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট রেখে দ্রুত পদোন্নতি করে। কয়েক বছরের একান্ত নিষ্ঠায় আমি যা পাই নি—অর্থাৎ আমার রাজনৈতিক তৎপরতায় আমি সাফল্য থেকে যতটা দূরে, ঠিক ততটাই দ্রুত বিজিতের উন্নতি। অল্প সময়ের ব্যবধানে সে ব্যাঙ্কের চীফ অ্যাকাউনটেনট। নগদ মোটা মাইনে, বিত্তসহ একটি নধর গৃহকর্ত্রী, স্ফীত উৎকোচ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জোয়ারে জীর্ণ বাড়ির কাঠামোতে গ্রীল, গেট, রঙ্গনের ঝাড় এবং কাচের জানালার দোতালা। ব্যাঙের ডাক, ফড়িঙের ঘূর্ণিপাক, বেগুনি ফুল রাবিশে চাপা পড়ল। আমার পুরোনো ঘরের জানালা খুললেই ফ্লুরেসেনট আলোর ঝলমলানি, তৃপ্ত গানের কলি। পুরোনো তিন কামরার পৈতৃক স্মৃতি এখন চটকদার নতুন বাড়ির লজ্জা। আমি পুরোনো ঘরেই থাকলাম, একেবারে পেছনের ঘরটায়। বাকি দুটো ঘরে মা-বাবার প্রাচীন ব্যবহৃত আসবাব, দুই বাড়ির বাতিল জিনিস এবং উদ্বৃত্ত কাঠ-লোহার আনডিল, কিছু মাকড়শা-আরশোলার অবাধ রাজত্ব এবং চামচিকের অস্থায়ী আবাস। আমি নতুন বাড়িকে ও-বাড়ি বলি। আমি কোনোদিন ওখানে যাই নি, ওখানে সুখ-নামের অদৃশ্য আলো কতটা নিবিড়, আমার দেখা হয় নি। মাঝে-মাঝে মায়া আসে, আমার ছোটো বোন। মশারি তোলে, বিছানা ঝাড়ে, শালিমার তেলের খালি কৌটো থেকে বিড়ির টুকরো, সিগারেটের ছাই পরিষ্কার করে, আমার বইপত্র ইশতাহার পার্টি-পত্রিকা গুছিয়ে তোলে। মায়ার কেমন একটা মমতা ছিল, মায়ের মতো, অর্থাৎ মায়েরা অসহায় সন্তানের জন্য যা দিয়ে থাকেন, যা আমি মার কাছে কোনোদিন পাই নি, শৈশবে কি পেয়েছিলাম জানি না, কারণ বোধ-নামের অনুভূতি তখন আমার ছিল না। মায়ার চোখে পিচ্ছিল করুণা চিকচিক করত। হঠাৎ মা হয়ে ও আমাকে শাসন করত। আমি দু-একদিন ওকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতাম, ওর শাসন মেনে নিতাম, ওর কথা শুনতাম, অর্থাৎ শুনেও মানতাম না।

এখন আমার সব অন্ধকার—সব আড়ালে থাকার, সরিয়ে রাখার, গুটিয়ে থাকার অন্ধকার। কোনো কোলাহল এখানে আসে না। নতুন বাড়ির স্টিরিও আমার জানালায় ধাক্কা দিয়ে ফিরে যায়। ডেকরেটিভ লাইট ভেতরের শ্যাওলা, খসেপড়া সুরকির মোটা দেওয়াল ভেদ করতে পারে না, আমার অন্ধকার কেড়ে নিতে পারে না। বাইরের উচ্ছলতা অন্ধকারে মূর্ছা যায়, অন্ধকার আমাকে আগলে

রাখে, মার কোলে ঘুমোনোর মতো অনাবিল শান্তিতে আমি মগ্ন থাকি, যদিও শেষ কবে আমি মার কোলে শুয়েছি আমার মনে নেই, শুলেও অনাবিল শান্তি পেয়েছিলাম কিনা তাও মনে নেই। তবুও অন্ধকারকে আমার এমনই মনে হয়। আমি অন্ধকার ভালোবাসি। মৃত্যুর পরে গভীর নিঃসীম অন্ধকার, এপার ওপার নেই, বাড়াকমা নেই, দিনরাত্রি নেই, আলো-নামের কোনো বিভীষিকা নেই, দীর্ঘ তীব্র অতলহীন অন্ধকার। আঃ, কী শান্তি! নিবিড়, নিশ্চল, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি। এমন অন্ধকার আমার ভালো লাগে। দার্শনিক মহামানবরা হয়তো এই কারণেই মৃত্যুকে ভালোবেসেছেন। এই পৃথিবী বড়ো কৃত্রিম, ডিমের খোসার মতো নানা তর্কে, বিপর্যয়ে, অবিশ্বাসের খোলসে মোড়া, অথচ ভেতরে স্ফুরণের তীব্র যন্ত্রণা। স্ফুরণের এই যন্ত্রণাই আমার স্মৃতি। সিঁদেল চোরের মতো অন্ধকার মনের ফোকরে ঢুকে পড়ে, বন্ধ চোখের পাতায় বিলি কাটে। ষাট দশকের শেষ অধ্যায়ের আমিকে দেখতে পাই—একের পর এক জিবি মীটিঙে ব্যস্ত। মাসাধিককাল বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কহীন। পশ্চিম বাঙলার শহর মফস্সল দাবড়ে বেড়াই। অন্তর্বিরোধ ভাঙন ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করি, যদিও জানি, বৈপ্লবিক ফতোয়া এবং সশস্ত্র বিপ্লব এক নয়। পার্টিতে মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব কায়েমি শক্তিতে বর্তমান। মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব পার্টিকে পরিচালিত করে। হয়তো এই কারণে পার্টিতে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেশি। ভূমিহীন কৃষক, কৃষিশ্রমিক আর ছোটো চাষীদের সংগঠিত করে বিক্ষিপ্ত কিছু সংগ্রাম হলেও কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। শহরের ফুটপাথবাসী লক্ষ-লক্ষ দিনমজুরের পাশে আমরা যাই নি, যাওয়ার চেষ্টা করি নি। তারা মূলত মঞ্চের নীচে বসা ভাড়াটে শ্রোতা। কিছু তরুণ ক্যাডার, জঙ্গী মনোভাবাপন্ন কিছু কর্মী কমরেড বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হলেও, প্রকৃত বিপ্লবের মশাল ছিল আমাদের হাতে। জাগরিত থেকো, উদ্দীপ্ত থেকো, সময় আসছে, কিন্তু এখনই সময় হয় নি ইত্যাদ ভাষণে সুবিধাবাদী হুঁশিয়ারি দিতাম। ফুঁ দিয়ে আগুন উশকে দিতাম, কিন্তু সতর্ক—শিখা যেন গায়ে না লাগে। তাপ থাকুক, কিন্তু যেন না পোড়ায়।

এই সময়ে পশ্চিম বাঙলা, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, পানজাবের শহর আর গ্রামাঞ্চল বারুদের গন্ধে উত্তাল। গ্রামাঞ্চলের মজুর, ভূমিহীন কৃষক, কর্মহীন বেকার যুবকদের মধ্যে কমিউনিস্ট চেতনার অনুপ্রবেশ শুরু হয়। সংক্ষিপ্ত, ত্রুটিপূর্ণ হলেও প্রকৃত গণসংগ্রাম শুরু হল। উৎসর্গিতপ্রাণ নিষ্ঠাবান বহু কমরেডের রক্তে মাটি ভিজে গেল। হানাহানি এবং আত্মকলহে পার্টির অগ্রগতি ব্যাহত হল।

আঃ, কী শান্ত নিরুপদ্রব অন্ধকার! অন্ধকার আছে বলেই মানুষ সুস্থ থাকে, স্বস্তি পায়। সব অস্বাচ্ছন্দ্য, কষ্ট, পীড়ন মানুষ অন্ধকারে কিছুটা ভুলে থাকে। এই অন্ধকার কারও শান্তির, ঘুমের, বিশ্রামের, আত্মোপলব্ধির। কিন্তু আমার? আমার তো নিয়ত অন্ধকার, অন্ধকারে জাগা, জাগার কারণেই ভাবা, ভাবনা মানেই স্মৃতি অর্থাৎ ব্যথা, রক্তঝরা। আমার শরীর চুঁইয়ে রক্ত ঝরে। অনেক দিন আগের কথা মনে পড়ে। শ্রদ্ধানন্দ পারকে পার্টি-পত্রিকার আন্দোলন সংক্রান্ত সভা। পার্টির ক্যাডারদের দিকে পুলিশ লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। আমি আচমকা মাথায় আঘাত পেয়েছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফেরে। আঘাতের গুরুত্ব বুঝতে পারি নি। কিন্তু চোখ আর নাক দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল। সেই রকমই এক অনুভূতি আমাকে রক্তাক্ত করে। কোথায় যেন একটা গভীর আঘাত, আমি ঠিক বুঝতে পারি না, অথচ রক্ত ঝরে। আমি কবর থেকে আমার অতীতকে টেনে তুলি, লোভের কলঙ্ক দেখে শিউরে উঠি। কিছু খুঁজি, শান্তি, মমতা অথবা স্নেহ . . .

কিন্তু যেখানে আমার স্নেহ, অর্থাৎ মমতার সামান্য শিহরন চেতনায় থিরথির কাঁপত এবং যে শান্তি আমাকে কর্মব্যস্ত দিনের শেষে বাড়িতে টেনে নিত, মানে নতুন বাড়ির পেছনে সোঁদা গন্ধের ঘরে, হঠাৎই সেটা হাতছাড়া হয়ে গেল। মায়া অর্থাৎ আমার ছোটো বোন, আমার শান্তি স্নেহ মমতা ইত্যাদি হঠাৎই আমাকে বলল, জানিস দাদা, আমি চাকরি পেয়েছি।

সে কী রে, এ তো মস্ত খবর।

না, মানে তোর বন্ধু তথাগত, মানে তোর বন্ধু ছিল, অনেক আগে, কলেজে, তার সঙ্গে একদিন দেখা হল। ও তো আগে আমাদের বাড়িতে আসত, তাই চিনতে পারলাম। তোর কথা বলছিল, এখনও নাকি সুযোগ আছে, তুই ওদের দলে যোগ দিলে . . .

মন্ত্রী হতাম। তথাগতকে আমি জানি, ওর কথা থাক। তোর চাকরির কথা বল।

সেই কথাই তো বলছি। ও তো এখন বিদ্যুৎমন্ত্রী। সরকারি গাড়ি নিয়ে ব্যারাকপুর থেকে ফিরছিল। আমি সিঁথির মোড়ে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে . . .

আর তুই গাড়িতে উঠে পড়লি? ছিঃ, তোর সম্পর্কে আমার একটা আশা ছিল, অন্য ধারণা ছিল। শেষ পর্যন্ত তুইও . . .

মায়া আর দাঁড়ায় নি। চাকরির যোগসূত্রটা আমি বুঝেছিলাম, অর্থাৎ আমার অনুমান সত্য। আমি তথাগতের কাছে হেরে গেলাম। তথাগত মানে দক্ষিণপন্থী ছাত্র আন্দোলনের বুরজোয়া নেতা, শখের রাজনীতির কারিকর, আমার কলেজের সহপাঠী, পার্টির শত্রু, সেই তথাগতের কাছে আমি হেরে গেলাম। মায়া তার কাছে চাকরিপ্রার্থী! ইচ্ছে করলে পাঁচ বছর আগেই আমি ওকে যে কোনো চাকরি, অর্থাৎ ওর যোগ্যতা অনুযায়ী কোনো পদে বহাল করতে পারতাম, শুধু বলার অপেক্ষা। কিন্তু এই ইচ্ছা আমার হয় নি, হতে নেই, পার্টি লাইনের পরিপন্থী। সুযোগ পেয়ে তথাগত আমাকে কৃপা করল। আমি খুব কষ্ট পেলাম। দেয়ালে টাঙানো লেনিনের ছবির নীচে দাঁড়ালাম, যেন কোনো প্রতিজ্ঞা নিয়ে দাঁড়িয়েছি, কোনো প্রতিরোধের স্পৃহা আমাকে দাঁড় করিয়েছে, আমি যেন শক্তি সঞ্চয় করতে চাই। লেনিনের ছবির নীচে দাঁড়ালে আমি কেমন যেন হয়ে যাই—ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ঘৃণা অহংকার ভুলে যাই, নিজেকে হারিয়ে ফেলি। এই ছবিটা আমাকে দিয়েছিল বীতশোক—বীতশোক চৌধুরী, আর্ট কলেজের প্রতিভাধর ছাত্র। আর্ট কলেজে পড়ার সময় ও আমার ছাত্র ছিল। অন্ধকার এক পোড়ো বাড়িতে মোমবাতির আলোয় তখন আমি কিছু পার্টি-সমর্থক যুবককে মার্কসবাদের শিক্ষা দিতাম, ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম ব্যাখ্যা করতাম। বীতশোক তাদের মধ্যে ছিল। হঠাৎ একদিন লেনিনের এই উজ্জ্বল তেলরঙের ছবিটা দিয়ে বলেছিল, গুরুদক্ষিণা। তার বর্ণ আজও অম্লান। অথচ বীতশোক সত্তরের আন্দোলনে শামিল হল। পুলিশের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে, সে নিজেই এক বর্ণময় ছবি হয়ে থাকল।

সুস্থ পরিবেশে আবার আমরা সক্রিয় হলাম। কলকাতার রাজপথে আবার লালপতাকার মিছিল, জনগণের দরবারে আমাদের ঘোষণা : এই আন্দোলন হঠকারী, আত্মহননের আন্দোলন, অপরিকল্পিত, বিচ্ছিন্নতাবাদী। জনগণ শামিল না হলে কোনো আন্দোলন সার্থক হতে পারে না এই আন্দোলন বুরজোয়াশক্তির হাত শক্ত করেছে মাত্র, বৃথা রক্ত ঝরিয়েছে, প্রগতি ব্যাহত করেছে। যখন প্রকৃত বিপ্লবের সময় আসবে, আমরা নির্দেশ দেব, হাতের মশাল এগিয়ে দেব। এখন ক্ষমতা দখলের লড়াই, এই রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে থেকে একেই ভাঙার লড়াই।

জনগণ-নামক নাগরিক মানুষ, শহরকেন্দ্রিক কলকারখানার মধ্যবিত্তচেতনাশ্রয়ী শ্রমিক, সরকারি আধাসরকারি অফিসের নিরাপত্তা এবং বেতন বৃদ্ধির ধ্বজাবাহী কর্মচারী, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত পরিবার আমাদের নির্বিঘ্ন জয়যাত্রায় শামিল হল। শহরের যানবাহন, স্বাচ্ছন্দ্য স্তব্ধ করে আমরা ময়দান ভরিয়ে ফেললাম। গ্রামের মানুষ নেতা-বা ক্যাডার-বাহিত হয়ে শহর উদ্বেল করল। মঞ্চের ওপরে পার্টি প্রেসিডেন্ট, সর্বভারতীয় সেক্রেটারি কমরেড রঙ্গনাথনের মাঝে বসে আমি তারিফ পেলাম।

অথচ সেই সাফল্য, সেই তারিফ আমাকে এখন পীড়া দেয়। আমি নিজেকে টুকরো-টুকরো করি। সেদিনের আমিটার গালে প্রতারক, ভণ্ড বলে চড় কষাই। সুযোগসন্ধানী, ক্ষমতালোভী আমিটাকে ঘেন্না করি, গলা টিপে ধরি, তার রক্ত চন্দনের মতো শরীরে ছিটাই। আমার সেই পুরোনো আমি তখন বল্গাহীন ঘোড়ার মতো সারা বাঙলা তোলপাড় করছে। আমার সামনে তখন অতিক্রমণের দীর্ঘপথ। রাষ্ট্রশক্তি দখলের লড়াইয়ে আমরা তখন মাতোয়ারা। আমাদের অভাবনীয় সাফল্যে জনগণকে অভিবাদন জানালাম। অবশ্য এ লড়াই পুরোপুরি রক্তপাতহীন নয়, বহু সংগ্রামী ক্যাডার নিহত। আমরা তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি, সভা করেছি, দু মিনিট নীরবতা পালন করেছি, পতাকা অর্ধনমিত রেখেছি। এও তো এক ধরনের বিপ্লব, রক্ত ঝরবেই এবং আমরা বিপ্লবে বিশ্বাসী।

রাজ্যের সর্বাত্মক ক্ষমতা আমাদের দখলে এল। আমাদের কর্মপদ্ধতি কতটা সুপরিকল্পিত, বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে তা প্রমাণিত হল। দেশবিদেশ থেকে

অভিনন্দন এল, ছবি ছাপা হল। জনসমর্থনে বিপুল জোয়ারে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির অহমিকা প্রায় নিশ্চিহ্ন। তথাগত আমাকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার সাফল্যে অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছিল। আমি উত্তর দিই নি। মন্ত্রিসভায় আমার নাম প্রস্তাবিত হল, আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। সংগঠনের দায়িত্ব নেওয়ায়, আমার নির্লোভ মহানুভবতা প্রতিষ্ঠিত হল। কমরেডরা সম্মিলিতভাবে আমাকে স্বাগত জানাল। পুরস্কারস্বরূপ আমি উত্তর কলকাতা জেলা কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হলাম, এবং সেনট্রাল কমিটির সদস্যপদ পেলাম।

মীটিঙ করি, লাইন নিয়ে আলোচনা করি, জনগণকে বৃহত্তর সংগ্রামের অপেক্ষায় সজাগ থাকতে আহ্বান জানাই। এখন কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি চাই ইত্যাদি ভাষণ দিয়ে বাড়ি ফিরি, অর্থাৎ সোঁদা গন্ধের ঘরে লেনিনের ছবিটার নীচে দাঁড়াই। বুকে ব্যথা অনুভব করি, কোথায় যেন পোকারা নড়েচড়ে, কুরে খায়। আমি ভুলে যাই, কোথা থেকে এসেছিলাম, কোথায় চলেছি, কোথায় যেন যাওয়ার কথা ছিল—সব ভুল হয়ে যায়। আমার ঘর, সে ঘরে সোঁদা গন্ধ, মায়ার স্নেহের ছোঁয়া, যত্ন ঝাড়পোঁছ, সেই ঘর এখন এলোমেলো। সারা বিছানায় পোড়া বিড়ি, সিগারেটের ছাই, ওলটানো মার্কস, পোসটারের রঙ মায়ার সময়াভাবজনিত অনুপস্থিতি ইত্যাদি এক বিশৃঙ্খলা। ঘরের কোনায় মাকড়শার জালে একটা মাছি। আমি ভয় পাই। কিসের ভয় বুঝতে পারি, কিন্তু বলতে পারি না, না পারায় কষ্ট হয়, ক্রমশ নির্বোধ হয়ে যাই, বড়ো অসহায় বোধ করি, অসহায়তার কারণে মায়াকে ডাকি। চিৎকার করতে হয়, আমি চিৎকার পছন্দ করি না, কিন্তু মায়া শুনতে পায় না, অতএব চিৎকার। মায়া দাপিয়ে ঘরে আসে—কী বলছিস, বল। বউদি এখন চা করতে পারবে না, কাজের লোক নেই, বেড়াতে গেছে, আমিও পারব না—টিভিতে এখন ভালো সিনেমা দেখছি, শেষ হলে দিয়ে যাব।

বিজিত কি টিভি কিনেছে নাকি?

বারে, মেজদা কিনবে কেন? চাকরিতে আমার প্রমোশন হল। এখন আমি রীতিমত অফিসার! ইনস্টলমেনটে একটা টিভি নিয়েছি।

আমাকে একবার জিগ্যেস করা প্রয়োজন মনে করলি না। দু বছর আগেও রেশন তোলার পয়সা জোগাড় করতে পারতাম না, আর তোরা টিভি কিনলি? হঠাৎ-বড়লোক ছাড়া পাড়ায় আর কোনো বাড়িতে টিভি আছে! গরিবের কথা ভাবিস না!

ও বাপু দেশ-উদ্ধার আমাকে দিয়ে হবে না। তুই যা করছিস কর। আমরা কি তোকে কিছু বলি?

মায়ার মুখ মায়ের মতো, মায়াকে দেখে আজ মাকে মনে পড়ল। মা এমনই করে কথা বলত। মায়ের মুখে যে বিদ্বেষের ছায়া ছিল, মায়ার মুখে দেখলাম। আমার অবসরের শেষ আশ্রয়—ঘরের কোণে জেলে-রাখা শেষ প্রদীপের আলো, আমারই চোখের তারায় নিভে গেল। আমি একা হয়ে গেলাম—বড়ো একা। বাড়ি ছেড়ে পার্টি অফিসে, অর্থাৎ জেলা কমিটির অফিসে আস্তানা নিলাম। সেখানেই আমার কর্ম, সাধনা, পাঠ এবং বিশ্রাম।

সাফল্যের পাঁচটা বছর, স্বাচ্ছন্দ্যের বছর। স্বাচ্ছন্দ্য কারণ তখন বিভিন্ন কমিটি, বোর্ড এবং অ্যাডমিনিসট্রেশনের আমি কর্ণধার এবং কর্ণধারণের কারণে রৌপ্যমুদ্রার আমদানি আমার পক্ষে পর্যাপ্ত। আমি সন্তুষ্ট, গৌরবান্বিত, নানা বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও পার্টির গতি অব্যাহত। প্রয়োজনে মন্ত্রীদের গাড়ি পাই, প্লেনে চড়ে দিল্লী যাই, পার্টি-পত্রিকায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি, তরুণ মন্ত্রীরা সমীহ করে। কিন্তু এই বিশাল-মর্যাদাসম্পন্ন আমিটা এক মজুর যুবকের কথায় হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। আচমকাই ঘটনাটা ঘটল।

সেদিন পার্টি-অফিসে বিভিন্ন সদস্য, ক্যাডার এবং সমর্থকসহ নিজের চেয়ারে বসে ছিলাম। একটি তেলচিটে চেহারার যুবক, অতি সাধারণ, ভুলে যাওয়ার মতো মুখ, পরিধেয় যথেষ্ট নোংরাই বলা যায়, আমার সামনে এসে দাঁড়াল। খুবই সাধারণ ভাষায় নিজের অভিযোগ জানাল। বাদল চক্রবর্তী নামে আমাদের এক ক্যাডার তার কাছে নাকি পঞ্চাশ টাকা দাবি করে। সে অক্ষমতা জানিয়েছিল। দুদিন পরেই প্রকাশ্যে, বাজারের মাঝে বাদল যুবকটির স্ত্রীর প্রতি অশোভন আচরণ করে। যুবকটি থানায় অভিযোগ জানিয়েছিল, কিন্তু ফল হল বিপরীত। বাদল তাকে পনের দিনের মধ্যে বাজার থেকে দোকান তুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেয়, নইলে পরিণাম নাকি সাংঘাতিক হবে। যুবকটি এখন আমার কাছে বিচারপ্রার্থী।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তোমার কিসের দোকান?

আজ্ঞে স্যার, বাজারের মোড়ে প্ল্যাসটিক কাপড়ে ঘেরা তেলেভাজার দোকান।

তুমি কি বিরুদ্ধ রাজনীতি কর?

এটা কী বলছেন স্যার? রাজনীতি করার সময় কই! সামান্য একটা তেলেভাজার দোকান চালাই। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত খাটি। ঘরে চার-চারটে প্রাণী। তাদের পেটের ভাত যোগাড় করতেই প্রাণান্ত। তারাও দিনভর খাটে। ব্যাসন গোলে, আলু সিদ্ধ করে, খোসা ছাড়ায়, পেঁয়াজলঙ্কা কাটে, তবুও স্যার পেট পুরে খেতে পায় না! খাবে কী—চালের কিলো পাঁচ টাকা, আলু দু টাকা, পেঁয়াজ চার টাকা, তেলের কিলো সাড়ে সতেরো টাকা। সবই তো আপনারা জানেন স্যার, বাজার তো আপনাদেরও করতে হয়। খদ্দেরদের জন্যে সরষের তেল কিনি, ঘরে র‍্যাশনের রেপসীডের তেল খাই, তাও নিয়মিত পাই না। সারাদিনের বেচাকেনায় লাভ হয় দশ টাকা। আপনি বিচার করুন স্যার, এতে নিজে খাব কী, ওদেরই বা কী খাওয়াব! আমার মতো মানুষ কি পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিতে পারে? আপনি হুকুম করলে এক দিনের রোজগার দিতে পারি, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা? দোকান তুলে দিলে না খেয়ে মরে যাব, স্যার।

পার্টি অফিসে আচমকা নীরবতা। উপস্থিত কমরেড আর ক্যাডাররা বাক্যহারা। যুবকটি যেন হঠাৎ কোনো আত্মীয়বিয়োগের খবর নিয়ে উপস্থিত, আমরা সবাই বিমূঢ়, শোকে মুহ্যমান। সেই শোক এখন বিশাল এক পাথরের মতো ভারি মনে হয়। প্রত্যেকে প্রত্যেককে দেখছি, কিন্তু দেখছি না; কিছু বলতে চাইছি কিন্তু পারছি না। ঠোঁট নড়ছে না, যেন মানুষের জন্য আজও ভাষা আবিষ্কৃত হয় নি।

যুবকটির কথায় আবার সচকিত হলাম, আপনি না দেখলে কোথায় যাব, স্যার? আমরা কি অপঘাতী হব!

পার্টির প্রবীণ সদস্য ধরণী ঘোষ বললেন, সত্যিই যা দিনকাল, দেড়শ টাকায় একটা মানুষের কুলোয় না, ওর তো চারটি পোষ্য।

আপনার নাম কী? আমি প্রশ্ন করলাম।

রতন স্যার, রতন মজুমদার।

আপনি এক পয়সাও চাঁদা দেবেন না। আপনাকে ধন্যবাদ, অন্যায় কিছু ঘটার আগেই আপনি আমার কাছে এসেছেন।

যুবকটি শ্রদ্ধায় নত হল—আপনি আমাদের বাঁচালেন, স্যার। আমার মনে থাকবে। পার্টি তো স্যার, আমাদের জন্যেই। কোনোদিন যদি গুছিয়ে তুলতে পারি, পঞ্চাশ টাকা চাঁদা নিশ্চয়ই দিয়ে যাব।

রতন চলে গেলে, আমি থানার অফিসারকে ধমক দিলাম, কর্তব্যপরায়ণ হতে বললাম এবং কর্তব্যের নিদর্শন অনুযায়ী বাদল চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হল। ওই সন্ধ্যায় এলাকার মন্ত্রীমশাই স্বয়ং উপস্থিত। চা, সিগারেট, কিছু খুচরো আলাপের পর আচমকা প্রস্তাব করলেন—বাদল চক্রবর্তীকে ছেড়ে দিতে বলুন। তার অ্যারেস্ট হওয়া পার্টির পক্ষে কলঙ্কজনক। তাছাড়া বাদল এই অঞ্চলের জঙ্গী ক্যাডার। ফ্রন্টে লড়াই করে, যুবসম্প্রদায়কে সংগঠিত রাখে এবং গত ইলেকশানে ওর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিনিময়ে আমরা ওদের কী দিতে পেরেছি বলুন? চাকরি নয়, পারমিট নয়। সামান্য একসেসেস হতে পারে।

আমি বিস্মিত, ক্ষুব্ধ। আমি বোঝার চেষ্টা করি—বাদল চক্রবর্তী নামে এক জুলুমবাজ ক্যাডার পার্টির কাছে কতটা অপরিহার্য।

আমার দ্বিধা দেখে মন্ত্রীমশাই আবার বললেন, আপনি এই অঞ্চলের সেক্রেটারি, তাছাড়া আমার পক্ষে থানায় কোনো নির্দেশ দেওয়া খুব শোভন হবে না। এমনিতেই ক্যাডাররা ক্ষুব্ধ, তারা দুপুরে আমার কাছে এসেছিল। অনুগ্রহ করে থানা অফিসারকে নির্দেশ দিতে দেরি করবেন না, আমি চলি।

দেখুন, এটা নীতির প্রশ্ন।

আমি ইতিমধ্যেই রিপোর্ট পেয়েছি। সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো। রতন নামে তেলেভাজাওয়ালার অভিযোগ আসলে ব্যক্তিগত আক্রোশের ভিত্তিতে পরিকল্পিত চক্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে ওই তেলেভাজাওয়ালাই সমাজবিরোধী। দারিদ্র্যের কারণে সে এবং তার পরিবারবর্গ অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করত। কমরেড বাদল

চক্রবর্তী এর প্রতিবাদ করে, ফলে সে চক্রান্তের শিকার হয়।

—আমার সংগৃহীত তথ্যও খুবই নির্ভরযোগ্য। আমি জানি, রতন নির্দোষ এবং বাদল চক্রবর্তী অন্যায় জুলুম করেছে।

—বেশ তো, এই বিতর্কের সমাধান অন্যভাবে করা যেতে পারে। সামান্য এক তেলেভাজাওয়ালা আমাদের মতানৈক্যের বিষয় হতে পারে না।

—আমি অক্ষম, আমাকে ক্ষমা করবেন।

—বেশ। সামনের টেলিফোন তুলে মন্ত্রীমশাই প্রেসিডেনটের নম্বর ডায়াল করলেন। যাবতীয় পূর্বাপর ঘটনা এবং আমার অনমনীয় দৃঢ়তাও তাঁকে জানানো হল। পরে, রিসিভারটা আমার হাতে তুলে দিয়ে, মন্ত্রীমশাই উঠে পড়লেন।

ওপাশ থেকে প্রেসিডেনটের গলা : কী সামান্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন! ওসব কি আপনার কাজ? বোম্বেতে ডক-শ্রমিকদের অ্যানুয়্যাল জেনারেল সেশান আছে বুধবার। আপনাকে যেতে হবে। এখন ওই তেলে-ভাজাওয়ালা একটা বিষয় হল? ওসিকে বলুন, ছেলেটিকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়।

টেলিফোন কেটে গেল। আমি রিসিভার হাতে স্থাণুর মতো বসে থাকলাম, প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেলাম না। তাঁর অপমান এবং আহত সম্মানে পার্টি প্রেসিডেনটের শেষ নির্দেশটুকু পালন করলাম।

সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির স্মৃতি, অস্থির যন্ত্রণার তোলপাড়, আহত সিংহের রুদ্ধগর্জন আমাকে সারা রাত জাগিয়ে রেখেছিল। আমার ছবির মতো সব মনে পড়ে। চেতনাহীন জড় পুতুলের মতো আমি চেয়ারে বসে ছিলাম। রাত্রি ক্রমশ বেড়ে চলে। পার্টির সদস্য, ক্যাডার, অন্যান্য মানুষেরা একে-একে চলে গেলেন। ঘোরতর এক অন্যায়ের আমি নীরব অংশীদার হলাম। আমার সারা গায়ে পাঁক, ক্ষতের যন্ত্রণা, মাছি ভনভন করছে, আমাকে দেখে সবাই ঘৃণা বা অনুকম্পা করছে। আমি অক্ষমতা নিয়ে নির্বোধের মতো ক্ষতের ঘায়ে মজে আছি। আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, আত্মনিয়োগ বাদল চক্রবর্তী নামের এক অসামাজিক যুবকের উপহাসের বিষয়। তার অন্যায়কে ক্ষমা করার জন্য মন্ত্রী দৌড়ে আসেন, প্রেসিডেনট নির্দেশ দেন! আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের কর্মধারা, পার্টি-জীবন, আনডারগ্রাউনডের কৃচ্ছ্রসাধনা, জেলের টুকরো আকাশের দিকে তাকিয়ে উদ্দীপ্ত আলোর স্বপ্ন, রাজপথে উদ্দাম মিছিল, রক্তাক্ত আঘাত বরণ, চায়ের ভাঁড় আর বিড়ির ধোঁয়ায় ক্ষয়িষ্ণু স্বাস্থ্য, নির্লিপ্ত সন্ন্যাসচর্যা, সংগ্রাম ইত্যাদি স্মৃতি আর বিস্মৃতি, সাফল্য আর ব্যর্থতা রাতের গভীরতায় শূন্য দেওয়ালে প্রক্ষিপ্ত হয়, আমাকে ব্যঙ্গ করে, পরিহাসে উচ্ছল হয়। বাঁতশোকের বর্ণময় মৃত্যু হঠাৎ ঝলসে ওঠে। পাশের রাস্তায় একদল শ্মশানযাত্রী বিকট ধ্বনিতে এগিয়ে চলে, বহুদূর পর্যন্ত অপস্রিয়মাণ হরিধ্বনি রাত্রির পরিবেশ ভয়ার্ত করে এগিয়ে চলে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। না, এ হতে পারে না। মানুষ নিজের প্রয়োজনে ভাষা সৃষ্টি করেছে, আগুন আবিষ্কার করেছে, বন্যপ্রাণীকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করেছে, শহর গড়েছে, প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছে। নিজের প্রয়োজনেই মানুষ তার পথ খুঁজে নেবে, আত্মরক্ষার কারণেই সে সংগ্রাম করবে, বাঁচতে শিখবে। হয়তো আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। তখন রাত্রি দুটো। শাদা কাগজে কাঁপা হাতে পার্টির প্রাথমিকসদস্যপদ ত্যাগের পত্র লিখলাম। পেপারওয়েট চাপা দিয়ে, বিছানা এবং দু-চারটে জামাকাপড় গোটালাম। রোজকার মতো পাশের হোটেল থেকে আনা খাবার টেবলে চাপা পড়ে আছে, ছুঁতে ইচ্ছে করল না। গ্লাসের জলটা খেলাম, চারমিনার ধরিয়ে কয়েকটা টান দিলাম। আঃ, নিজেকে এখন বেশ হালকা লাগছে, পরাজয়ের গ্লানি মন থেকে মুছে গেছে। এখন আমি সবাইকে ক্ষমা করতে পারি। রতন, তেলেভাজার দোকানদার রতনের জন্য আমার কিছু কথা থেকে যায় : রতন, তোমার কথাই সত্যি, পার্টি তোমা-দেরই—আমার নয়, মন্ত্রীর নয়, প্রেসিডেনটেরও নয়। তোমার পার্টিকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো।

বাইরে তখনও বেশ অন্ধকার, ভোরের আকাশে

ফ্যাকাশে তারার আলো। বিছানার পোঁটলা বগলে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। পুরোনো পৈতৃক বাড়ির পেছনের দরজাটায় দাঁড়ালাম। মায়া আমাকে দেখে নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে গেল। আমার ঘরের দরজা জানালা বহুদিন বন্ধ, সেই কারণে ভ্যাপসা শ্যাওলার গন্ধ, অন্ধকার, অন্ধ-কারে সূক্ষ্ম মাকড়শার জাল সারা শরীরে জড়ায়। বহু-দিনের খোলা অব্যবহৃত বিছানা, হিমশীতল, কবরের মাটির মতো ভেজা, কিছুটা শক্ত। আমি অর্থাৎ সেদিনের সেই আমি হতাশা, বেদনা, ক্ষরণ আর ক্ষমা নিয়ে লেনিনের ছবিটার দিকে তাকালাম। তেলরঙে আঁকা লেনিনের দৃপ্ত মুখ এখনও আশ্চর্য উজ্জ্বল। আমি সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

ভারতীয় সমাজে নারী-পুরুষসম্পর্ক

অশোক রুদ্র

যে-কোনো মূল্যায়নের কাজে কোনো স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট মাপকাঠি ব্যবহার না করলে কাজটিও যেমন ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য, তেমনি সেই মাপকাঠির কথা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে বলাও পাঠকের প্রতি কর্তব্য বলে মনে করি। অতএব বর্তমান প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক নারী-দশকের অন্তসীমায় ভারতবর্ষে নারীর স্থান কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার মূল্যায়ন করতে কী মাপকাঠি ব্যবহার করা হবে, তা স্পষ্টভাবে বলে নিতে চাই। নারীদের সম্পর্কে আমার স্বতন্ত্র কোনো মূল্যবোধ নেই। যে-কোনো মানবগোষ্ঠী সম্পর্কেই আমার যা মূল্যবোধ, নারীদের সম্পর্কেও তাই। এই মূল্যবোধটি হল মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতম বিকাশ। আমার ধারণা, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিহিত থাকে অনেক প্রকার সৃষ্টিশীল প্রতিভা। আমার জীবনদর্শন অনুযায়ী ওই নিহিত প্রতিভাগুলিকে প্রস্ফুটিত করার সাধনাতেই জীবনের সার্থকতা। সুখ-শান্তি-আরামে সেই সার্থকতা নেই। তাই যদি হত তো মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হত পশুর স্তরে থেকে যাওয়ায়। সুখের চেহারা বলতে আমার চোখে ভেসে ওঠে একটি কুণ্ডলীপাকানো বেড়ালের চেহারা—তার চেয়ে সুখী আর কে? তেমনি, শান্তির কথা বলতে আমার মনে আসে যে চির তা হল একটি গোরু, যে বসে-বসে জাবর কাটছে—তার চেয়ে শান্তি-পূর্ণ জীবন আর কার? অনেক মানুষই এইরকম জীবনই যাপন করে বটে। ওইরকম সুখ, ওইরকম শান্তির কথা ভেবেই অনেক নারী (এবং অনেক পুরুষ) তাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী নির্ধারিত করে থাকে। এই কথাটি একেবারে গোড়াতেই জোর করে বলে রাখছি এই কারণে যে, আলোচনাকালে আমি যা যুক্তি দেব তার কোনো-টিকেই খণ্ডন করা যাবে না এই ধরনের যুক্তিতে : "ঐ পথে কি সুখ পাওয়া যায়? এই উপায়ে কি জীবনের শান্তি বজায় থাকে?" আমার ধারণা অনুযায়ী, যে বিরল মানুষেরা মানুষের মতো জীবনযাপন করে, সুখ শান্তি আরাম তাদের কপালে বিশেষ জোটে না। কেউ যদি হয় শিল্পী তো সে ভোগ করে সিদ্ধিলাভে ব্যর্থতা-জনিত যন্ত্রণা। কেউ যদি হয় গবেষক, তার থাকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের দরুন অস্থিরতা। কেউ যদি হয় সমাজসংস্কারক তো তাকে অনেক সময় সহ্য করতে হয় অসীম নিগ্রহ। কেউ যদি হয় বিপ্লবী তো তাকে সারা-

জীবন সহ্য করতে হয় অনেক অত্যাচার। হয়তো প্রাণটাই দিয়ে দিতে হয়।

সুতরাং, ভারতবর্ষের নারী আজ কী অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে আমি তার বিচার করব এই নিরিখে : কী পরি-মানে তারা তাদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। কী ধরনের বাধা তাদের প্রতিভার বিকাশকে প্রতিহত করছে। বাধা অনেক রকম। কিছু বাধা রাষ্ট্রীয়। অর্থাৎ আইনগত। কিছু বাধা সামাজিক—সমাজের পরিবেশের চাপে প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই শুকিয়ে-যাওয়া বা ঝরে-পড়া ফুলের মতো তাদের সম্ভা-বনা নির্বাপিত হয়। কিছু বাধা মানসিক। আইন সুযোগ দিলেও, সমাজ বাধা না দিলেও, নারীরা নিজেরাই তাদের মানসিকতার দরুন নিজেদের সম্ভাবনার পথ অব-রুদ্ধ করে জীবনকে সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখছে।

নারীদের অবস্থা সংক্রান্ত আলোচনায় প্রায় সময়ই সমাজে তারা যে পুরুষদের তুলনায় কম সুযোগ-সুবিধা পায়, অর্থাৎ তারা যে বৈষম্যের ভাগী হয়, তার উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমি ওই বিশেষ দিকের উপর জোর দেব না। আমরা এমন অনেক অবস্থার কথাই আলোচনা করব যা পুরুষদের জীবনেও সার্থকতা অর্জনের পথে বাধা। বস্তুত, আমার জীবনদর্শন অনুযায়ী, নারীদের জীবন সার্থকতাবর্জিত হল আর পুরুষদের জীবন সার্থকতা অর্জন করল—তা হতেই পারে না। পুরুষ আর নারীর জীবন এতই ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে একজনের জীবন অসার্থক হলে অপর জনের জীবনও অসার্থক হতে বাধ্য। পুরুষেরা নারীদের অবদমন করে—এই কথার উপরেও আমি বিশেষ জোর দেব না। প্রথমত, ঘটনাটি সর্বাংশে সত্য মোটেই নয়। নারী-অবদমনের কাজটি প্রত্যক্ষভাবে অনেক সময় নারীরা নিজেরাই করে থাকে (মেয়ের ক্ষেত্রে মা-মাসি, বউয়ের ক্ষেত্রে শাশুড়ি-ননদ-জা ইত্যাদি)। দ্বিতীয়ত, পুরুষেরা যখন প্রত্যক্ষভাবে অবদমন করেও, তখনো তারাও নিশ্চয়ই লাভবান হয় না। অবদমনের ক্রিয়াটাই এমন যে তা যে অবদমিত তার মনুষ্যত্বকে যেমন খর্ব করে, তেমনি অবদমন করে যে, তাকেও করে আত্মিক অর্থে বঞ্চিত।

ভূমিকাস্বরূপ আরও একটি কথা বলে রাখা যাক। নারীদের অবস্থা বিচারে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে আমরা এই প্রবন্ধে তেমন গুরুত্ব দেব না। কথাটা বিস্ময়কর শোনাতে পারে। কারণ, এই মুহূর্তে গোটা দেশময় তোলপাড় চলেছে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বিধান যা এতদিন মেনে নেওয়া হয়েছিল, সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। সুপ্রীম কোর্ট থেকে সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভারতের সব নাগরিকদের একই আইনের অধীনে আনার জন্য। এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বহু রক্ষণশীল প্রগতি-বিরোধী মুসলমান নেতা নানাবিধ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন, ইসলামের স্ব-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের নামে। নারীদের অবস্থার বিচারে আইনের প্রসঙ্গকে তুলতে হলে আলাদা-আলাদা ভাবে হিন্দু নারীদের অবস্থা, মুসলমান নারীদের অবস্থা আলোচনা করতে হয়। সেই-প্রকার আলোচনার গুরুত্ব স্বীকার করলে শুধু জটিলতা-বৃদ্ধির ভয়ে তার থেকে বিরত হতাম না। কিন্তু আমার মনে হয়, নারীদের অবস্থার বিচারে আইনের গুরুত্ব বেশ কমই। আইন নেসেসারি, কিন্তু মোটেই সাফিসিয়েনট নয়। আইনের দিক থেকে অনুমোদিত হয়েও অনেক সুযোগ-সুবিধাই সামাজিক বা ব্যক্তিগত মানসিকতার কারণে নেওয়া হয় না। যেমন, বিধবাবিবাহ বা বিবাহ-ভঙ্গ অনেক দিনই হিন্দুদের মধ্যে আইনের সমর্থন পেয়েছে, কিন্তু কজন হিন্দু তার সদ্ব্যবহার করছে? বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে সেই কতকাল আগে। কিন্তু এখনও দরিদ্র শ্রেণীর তথা 'নীচু' জাতের পরিবারে আইনের চোখে বিবাহযোগ্য হওয়ার অনেক আগেই বালিকা কন্যাদের বিয়ে দেওয়ার প্রচলন ব্যাপক আকারে রয়েছে। অপরদিকে, হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার অনেক আগে থেকেই এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয়-বার বিবাহ করার প্রচলন কমে গিয়েছে। মুসলমান পুরুষদের এখনও চারটি বিয়ে করার অধিকার আছে, কিন্তু সেই কারণেই তাদের অনেকে যে চারটি করে বিয়ে করছে, তা মোটেই ঠিক নয়। মুসলমানদের বিবাহ-সংক্রান্ত আইন-কানুন যা আছে তা অবশ্যই ঘোরতর রূপে বৈষম্যমূলক, এবং সেই আইনের সংশোধন হওয়াও অবশ্যই অত্যাবশ্যক। কিন্তু এইপ্রকার আইন টিকে থাকতে পারতই না যদি মুসলমান জনগণের মধ্যে এবং তাদের নেতাদের মধ্যে মানবতাবিরোধী ভাবধারা প্রবল-প্রতাপে বিরাজ না করত।

আইনের কথা বাদ দিয়ে মানুষের মুক্তির পথে অন্য

দুটি যে বাধা, অর্থাৎ সামাজিক প্রথা এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে আত্মিক চেতনার উন্মেষের অভাব, তার ভিতরেই আমাদের আনাগোনাকে সীমিত রাখলে তা সম্প্রদায়নির্বিশেষে মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত সকল ভারতীয়দের প্রতিই প্রযোজ্য হবে বলে মনে হয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদিদের মধ্যে সামাজিক পরিবেশে আর মানসিক চেতনার উন্মেষে পরিমাণগত তফাত থাকতে পারে বটে, কিন্তু গুণগত তফাত খুব একটা আছে বলে মনে করি না।

আমাদের আলোচনার আরো একটি সীমার কথা পূর্ব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হল। তা এই যে, আমরা বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত নারীদের কথা আলোচনা করব ; দেশের অধিকাংশ নারী যারা দরিদ্র শ্রেণীর আর 'নীচু' জাতের, তাদের কথা ততটা করব না। তার প্রধান কারণ এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্ন শ্রেণীর আর 'নীচু' জাতের মানুষেরা উচ্চশ্রেণীর এবং 'উঁচু' জাতের মানুষের মূল্যবোধ, রুচি, জীবনধারা প্রভৃতির অনুকরণ করছে, যে ঘটনাকে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানে স্যানস্ক্রিটাইজেশন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের ওই বৃহৎ অংশের নারীদের অবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের অবস্থার চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। অতএব মধ্যবিত্ত নারীদের অবস্থার কথা আলোচনা করলে সমগ্র ভারতীয় নারীদের অবস্থার ঊর্ধ্বতম সীমার আলোচনা করা হয়ে যাবে। অবশ্যই ভুলে যাচ্ছি না যে কোনো-কোনো বিষয়ে, যেমন বিবাহভঙ্গ আর পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে, কোনো-কোনো উপজাতি আর 'নীচু' জাতের নারীরা মধ্যবিত্ত নারীদের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

বৃত্তি

কোনো মানুষের ভিতর নিহিত আছে যেসব প্রতিভা, তাদের সমাক স্ফুরণের সম্ভাবনা খুব বেশি পরিমাণে নির্ভর করে তার বৃত্তির উপর। শুধু নারী নয় এবং শুধু এদেশে নয়, সর্বদেশেই সর্বকালেই অধিকাংশ নারীপুরুষই জীবনধারণের জন্য এমন বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে যা তাদের অন্তর্নিহিত প্রতিভার স্ফুরণে সাহায্য তো করেই নি, বরং বাধা হিসেবে কাজ মার্কসবাদে এই সমস্যাটিকে এলিয়েনেশন নামে চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু পুরুষদের চেয়ে নারীরা তুলনাতীতভাবে বেশি পরিমাণে বৃত্তির দরুন ব্যক্তিত্ববিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তার কারণ, সনাতন সমাজ নারীদের জন্য মাত্র দুটি বৃত্তির দ্বার খোলা রেখেছিল। এক হল গৃহিণীবৃত্তি, অন্যটি হল গণিকাবৃত্তি। অধিকাংশ নারী অবশ্যই প্রথম বৃত্তিটিকেই বেছে নিয়েছে। দ্বিতীয় বৃত্তিটি বরাবরই চূড়ান্ত নিগ্রহের নিদর্শন হিসেবে গণিত হয়ে এলেও ইতিহাসের কোনো-কোনো অধ্যায়ে গৃহিণীদের চেয়ে গণিকারা গুণী-সমাজে অধিকতর সম্মান আর সমাদর পেয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাসবদত্তা বা বসন্তসেনাদের কালে নয়, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি, মাত্র একশ বছর আগেও মাদ্রাজ শহরে দেবদাসী-প্রথানীয়া রমণীদের অনেককে সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে একচোখে দেখা হত। এর কারণ আর কিছুই নয় : কালিদাসের যুগেও বটে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাদ্রাজেও বটে, নারীদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা-চারুকলার চর্চা প্রভৃতির প্রচলন ছিল মাত্র ওই গণিকা-সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমিত। বাদবাকি গৃহিণী-সম্প্রদায়ের নারীরা সকলেই ছিল আকাট মূর্খ এবং স্থূলরুচিসম্পন্ন, অপরিশীলিত মনের অধিকারী।

আজকের দিনের মধ্যবিত্ত সমাজে নারীরা আর নিরক্ষর অবশ্যই নয়, কিন্তু সংসারচালনাকেই একমাত্র বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করার যে ফুঁফল, তার একটা খুব ইতরবিশেষ হয় নি। সংসারচালনার কাজে যে কোনো-প্রকার দক্ষতার প্রয়োজন হয় না, তা মোটেই বলা হচ্ছে না। সেই কাজের মধ্যেও অনেক কল্পনাশক্তির প্রয়োগ সম্ভব, এবং তা করে অনেক নারী তৃপ্তিও পান। সন্তানপ্রতিপালনের কাজটা তো অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ, এবং অবশ্যই তা এক ধরনের সৃষ্টিশীল কাজ। কিন্তু বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজের দিকে ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। আদর্শ সমাজে প্রত্যেকেই নিজের ঝোঁক বা প্রবণতা অনুযায়ী সৃষ্টিশীল কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পাবে। রান্নাবান্না (যা অবশ্যই কলাশিল্পের মর্যাদা দাবি করতে পারে), সংসার-চালনা বলতে আর যা-সব বোঝায়, সন্তানপ্রতিপালন প্রভৃতির মধ্যেই আত্মা সম্পূর্ণ তৃপ্তি পায়, এমন নারী নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাদের অংশ শতকরা পাঁচ বা

দশের বেশি হওয়ার কথা নয়। বাদবাকি শতকরা নব্বই ভাগ নারী সুযোগ পেলে কর্মজগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে নিজেদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হত। কিন্তু সমাজ নারীদের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। আজকের ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষিত মহিলাদের মধ্যেও এইরকম সুযোগ যারা পায় তাদের অংশ নগণ্য। তার ফল হয়েছে এই যে, জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা, যা মানব-সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, তার প্রায় সবটাই পুরুষদের দান। মজা হচ্ছে এই যে, এই কথার উল্লেখ করে অধিকাংশ পুরুষ (এবং অধিকাংশ নারীও) যুক্তি দিয়ে থাকে, "দেখাই তো যাচ্ছে নারীদের চেয়ে পুরুষ-দের প্রতিভা অনেক বেশি। শেকসপীয়র হোক আর কালিদাস হোক, শংকরাচার্য হোক আর নিউটনই হোক, সকলেই তো পুরুষ। অতএব প্রমাণ হয়ে গেল, নারীদের প্রতিভা নেই। নারীদের বাড়িতে বন্দী থেকে রান্নাবান্না করা আর স্বামীর জামা ইস্ত্রি করার কাজে থাকাই ভালো।" এই নির্বোধেরা এইটুকুও ভেবে দেখে না যে নারীদের যদি নিরক্ষর করে রান্নাঘরে আর শোবার ঘরে বন্দী করে রাখা হয়ে থাকে তো কী করে তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইনের আবির্ভাব আশা করা যেতে পারে?

বিবাহকে বৃত্তি হিসেবে নেওয়ার আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কুফল এই যে এর দ্বারা নারীরা আর্থিক-স্বাধীনতা-বর্জিত হয়ে পড়ে। নারীজাতির সর্বপ্রকার সমস্যার আর অমর্যাদার প্রধান স্তম্ভই তাদের আর্থিক পরাধীনতা। কুমারী অবস্থায় পিতার, পরবর্তী জীবনে স্বামীর, এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন হওয়ার শাস্ত্রপ্রদত্ত অনুজ্ঞা মোটামুটি এখনও অধিকাংশ নারীই মেনে চলেছে। বিবাহিতা রমণীরা সংসারের জন্য যে কাজ করে থাকে তার যে কোনো আর্থিক মূল্য নেই, তা মোটেই বলা হচ্ছে না। বস্তুত, তারা যেসব কাজ করে থাকে তার প্রত্যেকটিই কোনো-না-কোনো পেশার অন্তর্গত, যার জন্য বাজারে নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারিত আছে। রান্নাবান্না, অন্য বাড়ির কাজ করার জন্য ঝি-চাকর পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য আয়া, বিদেশে গভর্নেস, বেবিসিটার প্রভৃতি পাওয়া যায়। শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য বেশ্যা পাওয়া যায়। সুতরাং গৃহবধূরা যেসব কাজ করে তাদের অর্থকর মূল্য আছে বই-কি। মূল্যটা কত তা বাজারদর দিয়ে হিসাব করে বার করা কিছু কঠিন কাজ নয়। বিদেশের কোর্ট-কাছারিতে বিবাহ সংক্রান্ত মামলায় আকছারই এই হিসাবটা করা হচ্ছে। নারী-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেক অর্থ-নীতিবিদও এই বিষয়ের উপর অনেক গবেষণা করে দেখিয়েছেন, কী বিপুলপরিমাণ আর্থিকমূল্যসম্পন্ন উৎপাদন গৃহবধূরা করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের বিবাহিতা রমণীরা কখনই হিসাব করে তাদের কাজের মূল্য নিরূপণ করে তার উপর আইনগত অধিকার অর্জন করে নেয় না। যদি নিত তো তারা বিবাহের মধ্যে থেকেই বেশ খানিকটা আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত। এইভাবে হিসাবনিকাশ পরিষ্কার না রাখায় স্বামীরাও মনে করে, স্ত্রীরাও মনে করে, যে তারা স্বামীর উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল।

অবশ্য এই হিসাব না রাখার পিছনে বিবাহিতা রমণীদের একটি সংকীর্ণ হিসাবি মনও কাজ করে। যদি বাজারদর দিয়ে হিসাব করতে হয় তো গৃহবধূদের সারা-দিনের কাজের মূল্য খুব একটা বেশি দাঁড়াবে না। যে পরিবারের আয় মাসে পাঁচশ টাকা, আর যে পরিবারের আয় মাসে পাঁচ হাজার টাকা—এই দুইয়ের মধ্যে সাংসারিক কাজের পরিমাণে আর প্রকারে খুব তারতম্য থাকে না। দরিদ্র শ্রমজীবী পরিবারে গৃহবধূর খাওয়া-পরার উপর যে খরচটা হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যের কাজ সে সংসারকে দেয়। কিন্তু পরিবারের আর্থিক মান যত উঁচু দিকে যায়, ততই গৃহবধূর কাজের পরিমাণ কমে আর তার নিজের উপর খরচের পরিমাণ বাড়ে। উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ সংসারকে যা দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশি নিজের জন্যে খরচ করে। এত শাড়ি-গয়না তারা কি কাজ করে উপায় করে? ফাঁকটা ভরাট করে স্বামীর দাক্ষিণ্য। এই দাক্ষিণ্য গ্রহণ করার দরুন ওই গৃহবধূদের সংসারে স্থান নিতান্তই অসম্মানকর।

এইবার আমরা সেইসব বিরল নারীদের কথা আলো-চনা করব যারা বৃত্তি হিসাবে শুধুমাত্র বিবাহকে গ্রহণ করে নি, বহির্জগতে কোনোপ্রকার অর্থকর কাজকেও গ্রহণ করেছে। এই কর্মজগতের পরিধি আমাদের দেশে এখনও অত্যন্ত সংকীর্ণ। খানিকটা সংকীর্ণতা বোধহয়

অনিবার্য—জৈবিক কারণে। নারীদের গর্ভধারণ করতে হয়; শুধু তাই নয়, প্রসবের অব্যবহিত পরবর্তী কিছুটা কাল সন্তানের জন্য এমন কিছু-কিছু কাজের প্রয়োজন হয় যা মাকেই করতে হয়, যা আর কেউ করে দিতে পারে না। যদিও এ ব্যাপারেও বৈজ্ঞানিক মত-ভেদের অবকাশ আছে। এই জৈবিক কারণের দরুন জীবনের বেশ কিছু সময় নারীরা বহির্জগতের কর্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। কিন্তু এই বাধাকে অতিরঞ্জিত করে দেখা হয়ে থাকে। পুরুষ নারী—উভয়েই দেখে থাকে। আজকের দিনে দুনিয়ায় প্রায় এমন কোনো কাজের কথাই ভাবা যায় না যা নারীরা প্রকৃতিদত্ত বাধার দরুন করতে অপারগ। মেয়েরা পুলিশের কাজ করছে, সৈনিক হচ্ছে, এরোপ্লেন চালাচ্ছে, পর্বত আরোহণ করছে, মহাকাশ-পর্যটন করছে। ডাকতারি, ইনজিনীয়ারিঙ, প্রশাসন, ওকালতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মেয়েদের কুশলতা তো অনেক দিন আগেই প্রতিপন্ন হয়েছে।

সুতরাং জৈবিক বাধা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বাধাই নয়। আসল বাধা সামাজিক। সমাজ চায় না যে মেয়েরা কর্ম-ক্ষেত্রে নিযুক্ত হোক। সমাজের সব অংশের লোকের মধ্যেই আছে বিভিন্ন ধরনের আপত্তি—যা বাধার সৃষ্টি করে। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা যারা তারা মেয়েদের নিয়োগ করতে চায় না; তাদের যুক্তি—মেয়েরা পারে না'। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে মেয়েদের প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ। একটু আগেই বলেছি, মেয়েরা এরোপ্লেন চালাচ্ছে। অনেক মেয়ে সে কাজ শিখেছে বটে, কিন্তু পাইলটের কাজ মেয়েদের দেওয়া হয় না। তাদের দেওয়া হয় মনোরঞ্জনকারী পরিচারিকার কাজ—সাজগোজ করে রঙ-চঙ মেখে যাত্রীদের খাদ্য পানীয় প্রভৃতি সরবরাহ করার কাজ। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ না হলেও ইচ্ছাকৃতভাবেই প্রবেশপথকে করে রাখা হয়েছে অত্যন্ত সংকীর্ণ। মেয়েরা কেরানি হয়, অফিসার খুবই কম হয়। ডাকতারি অনেক মেয়েই পড়তে যায়, কিন্তু পেশাগতভাবে ডাকতারি করে খুব কম নারী। আজকাল অনেক মেয়ে ইনজিনীয়ারিঙ পড়তে যায়, কিন্তু ইনজিনীয়ারিঙ দূরের কথা, বিজ্ঞানের যে-কোনো দিকেই যাওয়ার বিরুদ্ধেই বাধা হিসাবে কাজ করে প্রচলিত কিছু সংস্কার। এই সংস্কার অনুযায়ী মেয়েদের প্রতিভা থাকলে তা থাকে নাচ-গান-চারুকলা-হস্তশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে। দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে নয়। অধিকাংশ ছাত্রীদের নিজেদেরই ধারণা তাদের 'অঙ্কে মাথা নেই', যদিও এই ধারণার কোনোই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

কোন্ কাজ মেয়েরা পারে আর কোন্ কাজ পারে না—এই বিষয়ে কুসংস্কার ছাড়া অন্য এক বাধা হল, কী ধরনের কাজ ভদ্রতা আর শালীনতার বিচারে মেয়েদের যোগ্য—সেই বিষয়ে কিছু ধারণা। কর্মজগতের অধিকাংশ কাজকেই এই বিচারে বাতিল করে দেওয়া হয়। ভারত-বর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমবাঙলা এই বিষয়ে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। স্কুল-কলেজের অধ্যাপনার কাজ আর সরকারি অফিসের কেরানির কাজ—এই দুইয়ের বাইরে অধিকাংশ কাজই বাঙালি মধ্যবিত্তের চোখে নারী-দের সম্মানের পক্ষে বিপজ্জনক।

সমাজের সাধারণ লোকের এই মনোভাবের জন্য নিয়োগকর্তা বাধা না দিলেও এবং বাড়ির লোক আপত্তি না তুললেও নারীরা নিজেরাই বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করতে যায় না। যেমন নারসদের কাজকে ফ্লোরেনস নাইটেনগেল যতই সেবার আদর্শের মহিমায় উজ্জ্বল করে থাকুন না কেন, বাঙালি মধ্যবিত্তের চোখে নারসের কাজটা অপরিষ্কার এবং তাদের চরিত্র একটু ঢিলে-ঢালার দিকে। সেক্রেটারির কাজটা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু ওই কাজে বড়োসাহেবের সঙ্গে এত মেশামেশি করতে হয় যে তাতে তাদের চরিত্র নিশ্চয়ই অকলঙ্কিত থাকে না। দুঃখের কথা এই যে, এই ধারণাগুলি এমনই যে মানুষ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেগুলিকে আংশিক-ভাবে সত্য করে তোলে। যেমন অনেক অফিসার ধরেই নেয় যে তার সেক্রেটারির শালীনতার উপর খানিক কর্তৃত্ব ফলানোর অধিকার তার আছে। তেমনি অনেক অল্প বয়সের ডাকতার ধরেই নেয় যে নারসদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করার এক্তিয়ার তাদের আছে। এইভাবে সংস্কারকে অনুসরণ করে তাকে পরিণত করা হয় সত্যে। ফলে এমন এক সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যেখানে মেয়েদের সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধই থেকে যায়।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের যে আর-একটি অসুবিধা ভোগ করতে হয় তার মূলে আছে এই সামাজিক ধারণা যে, স্ত্রীকে স্বামীর তুলনায় নিম্নতর পদে থাকতেই হবে।

স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই যদি কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়, এবং স্ত্রীর পদ যদি হয় স্বামীর পদ থেকে উচ্চতর, তো প্রায়ই ঘটে যায় দাম্পত্য সংকট। স্বামী কখনই মেনে নিতে পারে না যে তার স্ত্রী কর্মক্ষেত্রে অধিকতর দায়িত্ব বা সম্মান বা বেতনের অধিকারী হবে। এই দাম্পত্য বিবাদের ভয়ে কর্মকর্তারাও অনেক সময়ে সংকটে পড়েন। একই অফিসে যদি স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করে তো নিয়োগকর্তারা প্রায়ই এই সমস্যায় পড়ে: "স্ত্রীটি অধিক কর্মকুশল, স্বামীটি তত কাজের নয়। কিন্তু কী করা যাবে! স্ত্রীকে কখনই প্রমোশন দিয়ে স্বামীকে অতিক্রম করতে দেওয়া যাবে না। একটা সুখের সংসার ভেঙে দেওয়ার দায়িত্ব নিই কী করে?"

নারীদের কর্মজীবনে অন্যতম প্রধান বাধা এই যে অধিকাংশ বিবাহিতা রমণীদের ক্ষেত্রেই স্বামীর কর্মের তুলনায় স্ত্রীর কর্মকে অনেক লঘু করে দেখা হয়। এই ঘটনাটির একটি জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় যখন কর্মক্ষেত্রে উন্নতির উপলক্ষে কোনো স্বামী এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। এইসব ক্ষেত্রে প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে স্ত্রীকে স্বামীর অনুগমন করতে হয়। আগে হোক পরে হোক, চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। নূতন জায়গায় গিয়ে চাকরির সন্ধান করতে হয়। প্রায় সময়ই যে স্তরের কাজ আগে করছিল তার চেয়ে অনেক নীচু স্তরের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অর্থাৎ স্বামীর কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য স্ত্রীকে নিজ কর্মক্ষেত্রে অবনতি মেনে নিতে হয়। অপরদিকে এমন কথা কেউ কখনো শোনে নি যে কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য স্ত্রীকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হল, এবং তার সঙ্গে থাকার জন্য স্বামী নিজের কাজকর্ম ছেড়ে স্ত্রীর অনুগমন করল। এই প্রসঙ্গে একটি আইন-গত বৈষম্যের কথা উল্লেখ করা যাক। দুনিয়ায় যে-কোনো জায়গায় থাকার সিদ্ধান্ত স্বামী নিক, স্ত্রী সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে বাস করতে বাধ্য। স্বামীর বাসস্থানে বাস করতে না গেলে আধুনিক আইন অনুসারেও শুধু সেই কারণেই স্বামী স্ত্রীকে ডিভোরস করতে পারে। কিন্তু উলটোটা সত্য নয়। কোনো স্ত্রী যদি চাকরি নিয়ে অন্য কোনো স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে তো সে দাবি করতে পারে না যে তার স্বামী এসে তার সঙ্গে বাস করুক।

শিক্ষা

অনেক শিক্ষিত নারী যদিও আজকের ভারতবর্ষে অর্থকর কর্মে নিযুক্ত রয়েছে তথাপি নারীদের যে জীবনের লক্ষ্য সংসার করা, সেই ধারণাটা এখনও সর্বশ্রেণীর মানুষের চেতনায় কতটা দৃঢ়মূল হয়ে গেঁথে বসে আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় শিক্ষার ব্যাপারে ছেলেদের আর মেয়েদের ভিন্ন চোখে দেখার মধ্যে। সমাজের সর্বস্তরেই ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার উপর অনেক কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। গরিব অর্ধশিক্ষিত পরিবারের ছেলেদের যদি হাই-স্কুল পর্যন্ত পড়ানো হয় তো মেয়েদের আরো অনেক আগেই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সংসারের কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এইরকম পরিবারের কথা না ভেবে শুধু সেইরকম পরিবারের কথা চিন্তা করা যাক যেখানে মেয়েদেরও বি.এ-এম.এ. পড়ানোটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এইরকম পরিবারের কোনো ছেলের সম্পর্কে ভাবাই যেতে পারে না যে কোনো কারণেই শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার আগেই তাকে স্কুল কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হবে। শিক্ষার সমাপ্তি বলতে আজকের দিনে শুধুমাত্র আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী অর্জন করা বোঝায় না। অনেক সময়ই সেইরকম ডিগ্রী অর্জন করার পরেও স্বদেশে বা বিদেশে গবেষণা, শিক্ষানবিশি প্রভৃতি করে আরও কয়েক বৎসর অতিবাহিত করা আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়। এর জন্য অর্থব্যয় করতে, অন্য সবভাবে সহযোগিতা করতে, পরিবার থেকে কোনো কার্পণ্য করা হয় না। মেয়েদের কিন্তু প্রায়ই কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে-পড়তেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। মাঝপথে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। যাদের বিয়ে হয় না তাদের ক্ষেত্রেও পড়াশুনোর কাজটাকে তাদের প্রাথমিক কর্তব্য বলে পরিবার থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয় না। ছাত্রীরা অনেক সময়ই নিজেদের তাগিদে অধ্যয়নের ব্যাপারে নিষ্ঠা প্রদর্শন করে। কিন্তু খুব কম পরিবারেই তাদের এই নিষ্ঠাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়।

মেয়েদের শিক্ষার কাজটাকে লঘু চোখে দেখাটা পরিবারের লোকেরা যেমন করে থাকেন, পুরুষ-শিক্ষকদের অনেকেও তেমনি করে থাকেন। অনেক শিক্ষকই গায়ে পড়ে মেয়েদের ডেকে উপদেশ দেন, তাদের এত উচ্চ-

শিক্ষার প্রয়োজন কী, গবেষণার জন্য বছরের পর বছর কুমারী থেকে যাওয়া কেন, বিয়ে করে সন্তানের জননী হওয়ার কর্তব্য তারা প্রতিপালন করছে না কেন? বাড়ির গুরুজনদের কাছে এবং শিক্ষকদের কাছে এইরকম বিরুদ্ধ মনোভাব দেখে মেয়েদের নিজেদের মধ্যেই শিক্ষার ব্যাপারে অনীহা আর অবহেলার ভাব আসা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় সময়ই দেখা যায় ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের মধ্যেই শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ আর নিষ্ঠা বেশি।

ঘরে

বিবাহিত হোক কি না হোক, বিবাহকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে থাকুক কি না থাকুক, পরিবারে নারীর স্থান, ভূমিকা আর মর্যাদা বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। স্ত্রীরা সেবিকা, পুরুষেরা সেবাগ্রহণকারী। এই বিষয়ে অনেকে বলে থাকেন—তা, একটু শ্রমবিভাজন তো থাকতেই হবে। পুরুষমানুষ সারাদিন খেটেখুটে অর্থ উপায় করে, তবে না সংসার চলে! সুতরাং বাড়ির কাজ সবই স্ত্রী করবে, স্বামী কুটোটি নাড়বে না, তাই তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক যে নয়, তার সপক্ষে অনেক যুক্তিই দেওয়া যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। চাকুরি-করা বিবাহিতা মেয়েদের উদাহরণ নিলেই দেখা যাবে যে, পুরো যুক্তিটাই ধসে পড়ে যায়। আজকাল অনেক পরিবারেই স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে। একইভাবে সকাল আটটা সাড়ে-আটটায় বেরিয়ে ছটা সাড়ে-ছটায় ফেরে। পথেঘাটে, ট্রামেবাসে, অফিসে একই পরিশ্রম দুজনকেই করতে হয়। কিন্তু সংসারের কাজ যা সাধারণ বিবাহিতা নারীদের করতে হয় তা সবই চাকুরে বিবাহিতা নারীদেরও করতে হয়। অফিসে যাওয়ার আগে এবং অফিস থেকে ফেরার পর সবটুকু সময়ই মেয়েদের ওই কাজে ব্যয় করতে হয়। আমাদের দেশের স্বামীরা গৃহস্থালির কাজে একেবারেই কোনো সহায়তা করে না। যদিও পাশ্চাত্য অনেক দেশ সম্পর্কেই একথা আর সত্য নয়। সেখানকার নারীরা সেখানকার পুরুষদের দিয়ে রান্না, বাসন ধোওয়া, শিশুদের দেখাশুনা করা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ বেশ ভালোভাবেই করিয়ে নেয়। এইখানে মনে রাখা ভালো যে, আজকাল আমাদের দেশের বিবাহিতা মহিলাদের বাড়ির সব কাজ তো করতে হয়ই, বাইরেও এমন অনেক কাজ করতে হয় যা আগে তারা করত না। আমাদের ছোটোবেলায় আমাদের মায়েরা বাজারে যেত না, ব্যাংকে যেত না, ওষুধের দোকানে যেত না, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দেবার জন্য শহরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেত না। এ ধরনের অনেক কাজই আজকাল বিবাহিতা নারীরা করে থাকে। এই ব্যাপারটা পুরুষেরা যে নারীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তা মনে করা ভুল হবে। অনেক ব্যাপার নিয়েই তো দাম্পত্য কলহ হওয়ার কথা শোনা যায়। এমন কি কখনও শোনা যায় যে স্ত্রী ঝগড়া করছে এই বলে, "তুমি রাঁধো, আমি রাঁধব না। তোমার বিছানা তুমি তোলো, তোমার কাপড় তুমি কাচো"? ঝগড়াতেও স্ত্রীরা এই-রকম কথা কখনো বলে না। অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীকে যে সোজা রান্নাঘরে ঢুকে যেতে হয়, স্বামীর জন্য চা আর জলখাবারের, পরে রাতের আহারের ব্যবস্থা করতে হয়, এই কর্তব্যটা তারা এমনই সহজভাবে মেনে নেয় যেন তা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। শুধু মেনেই নেয় না, গৌরবও অনুভব করে। এর প্রায় কোনো ব্যতিক্রম নেই। যে মেয়েরা অত্যন্ত আধুনিক ভাবনায় অভ্যস্ত, যারা হয়তো নিজেরাই দেখেশুনে বিয়ে করেছে, যারা হয়তো স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়েও সচেতন এবং সোচ্চার, তাদের মধ্যেও এই বিশেষ ব্যাপারে খুবই কম ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পতিসেবার আদর্শটাকে মেয়েদের মজ্জার একেবারে ভিতরে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তার থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন। সেবা অবশ্যই পরমধর্ম। কিন্তু পরিবারের মধ্যে তা হওয়া উচিত একতরফা নয়, সমতাসম্পন্ন এবং পারিবারিক।

বাইরে

শিক্ষায় বঞ্চিত হওয়ার দরুন এবং অত্যন্ত সংকীর্ণ কর্ম-ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকার জন্য যদি নারীরা ইতিহাসে অবদান খুবই কম রাখতে পেরে থাকে তো অন্য একটি আনুষঙ্গিক কারণ দৈনন্দিন জীবনে বহির্জগতে বিচরণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া। "পথি নারী বিবর্জিতা"—এই অনুশাসনটি ভারতবর্ষের অধিকাংশ নারীর ওপর খুবই কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়ে এসেছে এই সেদিন পর্যন্ত—এক তীর্থযাত্রা বাদ দিয়ে। এখন অবশ্য শুধু পথেঘাটে নয়, দেশেবিদেশেও অনেক ভারতীয় নারীকে পর্যটন করতে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘরের বাইরে চলাফেরা করার অধিকার আমাদের দেশের নারীদের এখনও অবিশ্বাস্য রকমে সীমিত। বয়স যতই হোক না কেন, নারীদের আজীবন নাবালকের চোখে দেখা হয়ে থাকে। তাদের দেখা হয়ে থাকে এমন কিছু হিসাবে যাকে সবসময় আগলে-আগলে, সামলে-সামলে, রক্ষা করে করে চলতে হয়। এর পশ্চাতে যে মানসিকতা কাজ করে তা হল নারীকে এক অতিশয় ক্ষয়প্রবণ সম্পত্তির চোখে দেখা। বিবাহের পূর্বে নারী পিতার সম্পত্তি। বিবাহে সেই সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় স্বামীর সম্পত্তিতে পরিবর্তিত হয়। হিন্দু বিবাহ-অনুষ্ঠানের কেন্দ্রের ঘটনাই তো 'কন্যাসম্প্রদান'। অবিবাহিতা মেয়েদের পিতার পদবী ধারণ করা এবং বিবাহিতাদের নানান প্রকার চিহ্ন বহন করা (হিন্দু নারীদের ক্ষেত্রে শাঁখা সিঁদুর লোহা ইত্যাদি) এই সম্পত্তির সম্পর্কটি ঘোষণা করে। সম্পত্তিমাত্রেরই রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। তা নয়তো তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নারী-নামক বিশেষ সম্পত্তিটির সম্পর্কেও এই মনোভাবটিকে খুবই প্রবলভাবে প্রকাশ হতে দেখা যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত উচ্চবর্ণের হিন্দু আর মুসলমান নারীরা ছিল অসূর্যম্পশ্যা। সূর্য বলতে অবশ্য পুরুষের চোখ বোঝায়। নারীদের এইভাবে রাখা হত যেন কোনো পুরুষের দৃষ্টিপাতের দরুন তাদের নারীত্বের চরম মূল্য-হানি না ঘটে। অত্যন্ত নিকট আত্মীয় ব্যতীত অন্যসব পুরুষের সামনে মুখকে ঘোমটার আড়ালে ঢেকে রাখতে হত। মুসলমানদের প্রথা তো ছিল আরও এককাঠি উপরে। আপন ভাইয়েরও বোনের মুখ দেখার অধিকার ছিল না। বাড়ির বাইরে বের হতে হলে কুৎসিত বোরখায় আবৃত হয়ে সাক্ষাৎ ভূতের মতন চেহারা গ্রহণ করতে হত। হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে এইসব প্রথা অনেকদূর হ্রাস পেয়েছে—পথেঘাটে বোরখাপরা মূর্তি আগের তুলনায় আজকাল কমই দেখা যায়। শহর এলাকায় হিন্দু নারীদের মধ্যে ঘোমটার প্রচলনও বেশ কমে গিয়েছে। অনেকেই একেবারেই দেয় না, যারা মাথার উপর কাপড় তুলে দেয়ও বা, তাদের মধ্যেও নাক পর্যন্ত নামিয়ে আনার ঘটনাটা কমই দেখা যায়। সুতরাং সূর্য আজকাল মহিলাদের অঙ্গ বেশ ভালোরকমই দেখতে পায়। শহর অঞ্চলে শুধু মুখ নয়, পেট, পিঠ, কাঁধ, এমন কি বুকেরও বেশ খানিক অংশই নারীদের রূপসজ্জার ফ্যাশনের দৌলতে বহুলে পরিমাণেই দৃশ্য-মান। কিন্তু এই কারণে নারীদের ঘরের বাইরে চলাফেরা করার স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে—তা একেবারেই মনে করা যায় না।

কোনো মহিলা বাড়ি থেকে কোথাও যাবেন। প্রায় সময়ই, দিনমানেই, তাঁকে সঙ্গে পুরুষ প্রহরী নিতে হয়। দিনমানে না হয়ে রাতবেরাতে হলে তো কথাই নেই। ধারণাটা এই যে, এইরকম প্রহরী না-থাকা মেয়েদের পক্ষে বিপজ্জনক। একা, এমনকি একজে অনেক নারীও, যদি পথে বার হয় তো মনে করা হয় যে তাদের দুর্বৃত্তের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই সঙ্গে এও মনে করা হয় যে, সঙ্গে যদি কোনো পুরুষমানুষ থাকে তো সেই বিপদের সম্ভাবনা কমে যায়। ধারণাটা এতই ব্যাপক, এতই সর্বজনগৃহীত যে তার যে একাধিক হাস্যকর দিক আছে তা আমাদের চোখেই পড়ে না। একটি নারীর সঙ্গে একজন নয়, যদি তিন-চার জন সাধারণ পুরুষও সঙ্গী হিসাবে থাকে তো তাদের সকলকেই কাবু করে ওই নারীর উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করা একজনমাত্র সশস্ত্র দুর্বৃত্তের পক্ষেও মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রায় সময়ই চার-পাঁচ জন বয়স্কা নারীরও একসঙ্গে পথে বের হওয়ার বিপদ কাটাতে একজন মাত্র পুরুষ সঙ্গীকেই যথেষ্ট বলে মনে করা হয়—সেই পুরুষ যতই দুবলা-পাতলা ক্ষীণজীবী মানুষই হোক না কেন।

নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন—এই ধারণাটা জনমানসে এতই সাধারণভাবে গৃহীত যে তা সমাজে নানানভাবে প্রাতিষ্ঠানিক আকার গ্রহণ করেছে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হসটেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে থাকে নানারকম কড়াকড়ি। যা অনেক সময়ই হয় খুবই হাস্যকর। কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রায় কোনো নিয়মেরই বালাই থাকে না, তারা প্রায় যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মেয়েদের হসটেলে সন্ধ্যাবেলায় কটার মধ্যে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, মোটে বাইরে যাওয়া যাবে কিনা, গেলে কতদূর যাওয়া যাবে,

বাড়ি যেতে গেলে কোনো অভিভাবককে নিতে আসতে হবে কিনা, কোনো লিখিত অনুমতি নিয়ে আসতে হবে কিনা—এসব বিষয়ে কতরকম যে নিয়মকানুন থাকে তার ইয়ত্তা নেই। আরো সাংঘাতিক, বিবাহিতা নারীমাত্রকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হতে, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে বা কোনো হসটেলে সিট পেতে স্বামীর নামকে গার-জিয়ান হিসাবে দিতে হয়। মহিলার যতই বয়স হোক না কেন, এবং তিনি যদি নিজের আয়ে নিজের খরচ চালান, তা সত্ত্বেও। এই নিয়মের ফলে কোনো বৈবাহিক সংকটে স্বামী ইচ্ছে করলেই তার স্ত্রীর লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে পারে, এবং অন্য নানাভাবে তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। উচ্চশিক্ষিতা চাকুরি-করা নারীরাও যে এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করে না, তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

সখ্য—প্রেম—যৌন আনন্দ

এইবারে আমরা যে প্রসঙ্গে আসব তা হল নরনারীর মধ্যে সম্পর্কের এমন এক অবস্থা যার দরুন শুধু নারীরা নয়, পুরুষেরাও থেকে যায় জীবনে নিদারুণভাবে বঞ্চিত। মার্কস বলেছিলেন, মানুষের ইতিহাস তো শুরুই হয় নি, এতদিন যা চলে এসেছে তা তো শুধু মানুষের প্রাক্-ইতিহাস। এই কথাটা অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক পীড়ন সম্পর্কে যতটা সত্য, ততটাই সত্য নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে। কিন্তু মানুষ যদিও আজ পর্যন্ত বনা জানোয়ারের মতোই জীবন কাটিয়েছে, তারই মধ্যে মানুষ স্বপ্নও দেখেছে। এমন উন্নত সভ্য অবস্থার কথা কল্পনা করেছে যা সম্ভব হবে মানুষের প্রকৃত ইতিহাসে। যে স্বপ্ন, যে কল্পনা, প্রকাশিত হয়ে এসেছে কাব্যে এবং সংগীতে, কিন্তু যার নাগাল বাস্তব জীবনে খুব কম লোকেই পেয়েছে। মানবজাতির অর্ধেক স্ত্রী, অর্ধেক পুরুষ। মানুষের এই এক অপরিমেয় দুর্ভাগ্য যে তাদের অর্ধেকের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা অপর অর্ধেকের অন্তর্ভুক্তদের সংগে সখ্য-সম্পর্কের সম্ভাবনা আর সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আমাদের দেশে অনাত্মীয় কোনো পুরুষ আর নারীর মধ্যে সখ্য-সম্পর্ক স্থাপনের প্রায় কোনো সম্ভাবনাই নেই। একমাত্র যে সম্পর্ক সম্ভব তা হল বিবাহের। বিবাহ ছাড়া অন্য যে সম্পর্ক সব কালেই সব সমাজেই অন্তহীন, অবিশ্রাম ভাবে কীর্তিত হয়ে এসেছে তা হল নরনারীর প্রেম। প্রেম অবশ্যই জীবনকে দেয় পরম ঐশ্বর্য, এবং এই ঐশ্বর্যের থেকে আমাদের দেশের অধিকাংশ নরনারীই বঞ্চিত থেকে গিয়েছে। কিন্তু প্রেমের প্রসংগে পরে আসছি। নর-নারীর মধ্যে যদি ব্যাপক আকারে সুন্দর, সুস্থ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে হয় তো তার জন্য প্রয়োজন নরনারীর মধ্যে অবাধ বন্ধুত্বের বিকাশ এবং প্রসার। প্রেম নয়, বন্ধুত্ব। প্রকৃত প্রেম, যাকে আবু সয়ীদ আইয়ুবে সংগত-ভাবেই "মানবজীবনের গভীরতম ও মহত্তম আনন্দের অন্যতম উৎস"[১] বলে বর্ণনা করেছেন এবং রবীন্দ্রসংগীতে যার প্রকাশ সম্পর্কে লিখেছেন, "প্রেম যে আমাদের জীবনকে কতো উপরে তুলতে পারে—এই পরমাশ্চর্য অনুভূতিতে যে কতো বর্ণ কতো গন্ধ, কতো দেহলী, কতো অন্তঃপুর, কতো রবিকরোজ্জ্বল সোনালীরুপালী শিখর কতো অন্ধকার ভূগর্ভস্থ গোপন কক্ষ, কতো সমুদ্র কতো আকাশ লুকানো রয়েছে তা কি আমরা আগে জানতাম?"[২] তা এতই দুর্লভ যে সেই অভিজ্ঞতা প্রায় অলৌকিকতার পর্যায়ে পড়ে। বিরলসংখ্যক সাধক ব্যক্তি-দের দুর্লভ সিদ্ধির মতোই এই অভিজ্ঞতাও অধিকাংশ সাধারণ মানুষের নাগালের অনেক বাইরে। অপর দিকে, সামাজিক পরিবেশ যদি অনুকূল হত তো নরনারীর মধ্যে সখ্যের সম্পর্কটা সাধারণ মানুষেরও আয়ত্তে আসতে পারত এবং জীবনকে অভূতপূর্ব পরিমাণে সমৃদ্ধ করত। প্রেম অবশ্যই মূল্যবান, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনকে ঐশ্বর্যশালী করতে সখ্যের ভূমিকা আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রেম আর বন্ধুত্বের মধ্যে যে প্রভেদটা করছি, তা মোটেই যৌনতার উপর নির্ভরশীল নয়। যৌন সম্পর্ক বাদ দিয়েও প্রেম সম্ভব, আবার বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে যৌনতা প্রবেশ করলেই তা প্রেমে পর্য-বসিত হয় না। প্রেমের মোহিনী মায়া আর রঙিন কল্পনা বন্ধুত্বে অনুপস্থিত। বন্ধুত্বের সম্পর্কে থাকে এক মনের মিল যা তাকে দেয় এমন এক স্নিগ্ধতা, স্থিতি-শীলতা আর নির্ভরযোগ্যতা যা প্রেমের সম্পর্কে প্রায়ই থাকে না। কিন্তু এইপ্রকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক হওয়ার মতো পরিবেশ আমাদের সমাজে এখনো একেবারেই তৈরি হয় নি। বন্ধুত্ব হবে কী করে, নারীপুরুষে তো পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগই পায় না। যে

অল্পসংখ্যক নারী ঘরের বাইরে কাজ করে, বা বছরের পর বছর পুরুষদের সংগে পাশাপাশি ডেসকে বসে কাজ করে যায়, তাদের মধ্যেও বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায় তা গড়ে ওঠার ঘটনা এখনও ব্যতিক্রমস্থানীয়।

বন্ধুত্ব হয় না বটে, কিন্তু প্রেমে পড়ার ঘটনা মাঝে-মাঝে ঘটে যায়। অবশ্য প্রেম বলতে যে সাধকদের অলৌকিক অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার তুল্য অনুভূতির কথা উল্লেখ করেছি, তার কথা হচ্ছে না। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনে প্রেম বলতে যা ছিল তার শুদ্ধতম নির্যাস পাওয়া যায় "একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি", অথবা "এখনো তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি—মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি" প্রভৃতি রবীন্দ্রসংগীতে। এই একই ভাবের তীব্রতর এবং স্থূলতর প্রকাশ ক্লান্তিহীন বিরামহীন ভাবে মার্গসংগীতে, রাগপ্রধান গানে এবং আধুনিক বাঙলা গানে চিরন্তন হয়ে রয়েছে। বাস্তব জীবনে প্রেম বলতে ছিল জানালার পরদার আড়ালে বা ছাদে ভিজে কাপড় মেলতে দেওয়ার কাজে রত কোনো মেয়েকে দেখে ফেলে কোনো ছেলের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটা। গত কয়েক দশকে সংখ্যাগত পরিবর্তন হয়তো খানিক ঘটেছে, কিন্তু তা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। গানে কবিতায় গল্পে উপন্যাসে প্রেম যতই আসর জাঁকিয়ে বসে থাকুক না কেন, এখনও বাস্তব জীবনে প্রেম সম্পর্কে আমাদের সমাজের মনোভাব নিতান্তই বৈরী-ভাবাপন্ন। ব্যতিক্রমস্থানীয় ঘটনা যদি কখনো ঘটে যায়, কোনো ছাত্রছাত্রী বা অফিসের সহ-কর্মী বা একই পাড়ার প্রতিবেশী কোনো তরুণ-তরুণী যদি পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায়, তো তখন সমাজের সমস্ত শক্তি উঠে-পড়ে লেগে যায় নিন্দে করে, উপদেশ দিয়ে, জোর খাটিয়ে দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য। তারা যে একটা অত্যন্ত দুর্নীতিপূর্ণ গর্হিত কাজ করছে, এ বিষয়ে যেন কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই। পিতামাতা যদি আপত্তি নাও করে তো আত্মীয়-স্বজন গায়ে পড়ে এসে পিতামাতাকে শাসন করে যায়, পাড়াপ্রতিবেশীদের চোখের ঘুম চলে যায়। প্রায় সব সময়ই সমাজই জয়ী হয়। তরুণ-তরুণীদের জোর করে আলাদা করে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। এবং প্রেম সম্বন্ধে আমাদের সমাজের দৃষ্টিভংগি এতই দ্বিধাবিভক্ত যে সেই মুহূর্ত থেকেই প্রেম আর নিষিদ্ধ থাকে না, পরিণত হয় পবিত্র কর্তব্যে। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই প্রত্যাশা করে—সেই মুহূর্ত থেকেই জোর করে বিয়ে দেওয়া নবদম্পতি হবে পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত।

প্রেম সম্পর্কে যদি সমাজের মনোভাব হয় এইরকম দ্বিধাবিভক্ত তো সহজেই বোঝা যায় যৌনতা সম্পর্কে তা হবে আরও কত বেশি। "নিবিড় প্রেমের অংগীভূত ইন্দ্রিয়সুখ অনা-এক পর্যায়ে উঠে যায়, তার সংগে শিল্প-কর্মসঞ্জাত রসানন্দের তুলনা অসমীচীন নয়"[৩] বলেছেন আবারও সেই আবু সয়ীদ আইয়ুবে। এই রসানন্দের বিষয়টা আমাদের সমাজে আলোচনায় নিষিদ্ধই থেকে গিয়েছে বলা চলে, এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় তা যে মানুষের নাগালে খুবে একটা আসে নি তা মনে করার অনেক হেতু আছে। সম্বন্ধ-করা বিয়ের চুক্তিটা অবশ্যই, একজন অত্যুগ্র প্রতিবাদী মহিলার ভাষায়, "স্ত্রী দিনে দেবে শ্রম, সেবা আর রাতে দেবে শরীর"।[৪] যদিও এই-প্রকার বিবাহেও, দৈনন্দিন জীবনের স্থূলতার মধ্যেও, পঙ্কে পঙ্কজের মতো আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের দাম্পত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধা ভালোবাসা মায়া মমতা প্রভৃতি যে জন্মলাভ করে তা অস্বীকার করলে শূন্যতাবাদী মনের অজ্ঞতা প্রকাশিত হবে। কিন্তু শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-মায়া-মমতার কথা তো আপাতত বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, যৌন আনন্দের কথা। এই আনন্দ কখনোই সম্ভব হয় না সেই সম্পর্কে যাকে আমাদেরই অন্য এক মহিলা-কবি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সত্যতাসহকারে "কবন্ধ দেহ"ে ভোগ বলে বর্ণনা করেছেন। এইরকমটা হওয়া অনিবার্যই ছিল, কারণ "রটনা করা হয়েছে এক সময়—মেয়েদের সামর্থ্যই নেই সুখ পাওয়ার। যেন সে শুধুই একটা যন্ত্র, যন্ত্রী নয়"।[৫] নারীকে কবন্ধ-দেহের অধিকারী এবং কেবলমাত্র যন্ত্র বলে মনে করার প্রতিবাদ করছেন যে মহিলারা, তাঁরা মনে হয় একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। এই সম্পর্কে নারীরা বঞ্চিত, পুরুষরা লাভবান—তা কি কখনো হতে পারে? নারী যদি হয় যন্ত্র আর পুরুষ যদি হয় যন্ত্রী তো তাদের মিলনে কোনো রাগের মূর্ছনাই কি সম্ভব? "নিবিড় প্রেমের অংগীভূত ইন্দ্রিয়সুখ"—তা তো তখনই সম্ভব যখন সম্পর্কটা হয় যন্ত্র আর যন্ত্রীর নয়, সংগীতে যাকে বলে যুগলবন্দী বা ইংরেজীতে বলে ডুয়েট—তার মতো। বেঠোফেনের সোনাটায় পিয়ানো আর বেহালা—

এই দুইয়ের সঙ্গতে কে কাকে ব্যবহার করে? আলি আকবরের সরোদ আর রবিশঙ্করের সেতার যখন পরস্পরকে জবাব দেওয়ার খেলায় রত হয় তখন যে রসের সৃষ্টি হয় তাই কি হওয়া উচিত নয় যৌন মিলনের আদর্শ? উচ্চতম স্তরের সংগীতের তুলনা এনে ভুল করেছি বলে মনে করি না। কামকেও যে সূক্ষ্ম কলা হিসাবে দেখা যেতে পারে তার কথা তো আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকাররাই ভেবে গিয়েছেন। কিন্তু বাৎস্যায়ন প্রমুখেরা যে ভুলটি করেছিলেন তা হল, কামকে নিতান্তই শারীরিক স্তরের ক্রীড়ার চোখে দেখা। শুধু সেই চোখে দেখলে কামকলার পরিণতি যে কী ভয়াবহ হতে পারে তা উৎকীর্ণ হয়ে আছে খাজুরাহো, কোনারক প্রভৃতি মন্দিরগাত্রে। ভাস্কর্যের বিচারে ওই কামকলা যতই উচ্চতম স্তরের হোক, যে জীবনাদর্শ তাতে প্রতিফলিত তা অবশ্যই ন্যক্কারজনক। কিন্তু বাৎস্যায়নদের পরে তো অনেক কাল কেটে গিয়েছে। আধুনিক মনের কাছে ওই মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য কখনোই নরনারীর যৌনতার আদর্শ হতে পারে না। সেতার-সরোদের যুগলবন্দীকেই হতে হয় সেই আদর্শ।

ইডিয়োলজি

নরনারীর সম্পর্কে প্রেম নেই, বন্ধুত্ব নেই, যৌন আনন্দও অনুপস্থিত। এসবেরই কারণ ঘুরেফিরে একই। নারীদের সম্পর্কিত এক অত্যন্ত পরাক্রান্ত ভাবধারাকে সমাজের সকলে মেনে নিয়েছে যা, নারীপুরুষনির্বিশেষে সকলকেই সার্থকতাহীন, প্রেমহীন, যৌন-আনন্দবিহীন জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছে। এই ভাবাদর্শ অনুযায়ী নারীরা দুর্বল, পুরুষেরা সবল। নারীদের স্থান ঘরে, পুরুষদের ভূমিকা বাইরে। নারীদের যে-কোনো বিষয়েই প্রতিভা পুরুষদের চেয়ে কম—এক গৃহস্থালির কাজ বাদে। এই ভাবধারা অনুযায়ী নারীরা সন্তানের জনক এবং যৌনতার ধারক। একই কালে স্বর্গাদপি গরীয়সী এবং নিছক যৌনবস্তু। শুধু পুরুষেরা নয়, নারীরাও এই চোখেই নিজেদের দেখে থাকে। এই দেখার প্রেরণাতেই না নারীরা রূপচর্চায় এতটা আগ্রহী হয়। সমাজে নারীদের গুণের সমাদর নেই। মূল্য দেওয়া হয় তাদের রূপের। কোনো মেয়ে দেখতে ফরসা হলে (যাকে আমাদের দেশে রূপের প্রধান লক্ষণ বলে মনে করা হয়ে থাকে!) তাকে নিয়ে শিশুবয়স থেকে এত লোফালুফি করা হয় যে কোনো গুণ অর্জনের জন্য সে বিশেষ তাগিদ অনুভব করে না। অপরদিকে কোনো মেয়ের নাক চোখ মুখ যদি প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সুন্দর না হয় তো তাকে শিশুবয়স থেকে ঘরে বাইরে সর্বত্র লাঞ্ছনা গঞ্জনা শুনতে হয়, যেন সেটা তার অপরাধ। এই আদর্শ নারীমাত্রকেই পণ্যরূপে দেখে থাকে। সতী নারীরা গণিকাবৃত্তি-অবলম্বনকারী নারীদের 'পতিতা'র চোখে দেখে থাকে। কিন্তু গণিকারা যেইভাবে রূপ সাজসজ্জা প্রসাধন ইত্যাদি দিয়ে ক্রেতা আকর্ষণ করার চেষ্টা করে আমাদের দেশে কনেদেখা-নামক অনুষ্ঠানে মেয়েরা অবিকল একইভাবে নিজেদের প্রদর্শন করে বরপক্ষের কাছে। এই ধারণা অনুযায়ী নারীরা পুরুষের অধীন। এই অধীনতাকে বিবাহিতা নারীরা ঘোষণা করে স্বেচ্ছায়, সানন্দে, নানাপ্রকার চিহ্ন ধারণ করে। যেসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে পদবীর প্রচলন ছিল না সেখানেও নারীরা স্বামীর পদবী গ্রহণ করতে শুরু করেছে। অত্যন্ত প্রগতিশীল বিবাহিতা হিন্দু মহিলারাও নিষ্ঠাসহকারে শাঁখাসিঁদুরলোহা পরে থাকে। অত্যন্ত আধুনিক পরিবারেও স্বামীকে খেতে দেওয়ার আগে স্ত্রীরা খায় না। এই ইডিয়োলজি নারী আর পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে। যেমন, পুরুষদের পক্ষে সিগারেট খাওয়াটা পৌরুষের লক্ষণ—নাটকে সিনেমায় বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে নায়ক বিশেষ ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাচ্ছে না ভাবাই যায় না। পুরুষদের মদ্যপানও সামাজিক মর্যাদার সূচক হিসাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সিগারেট খায় যে মেয়ে তার বিয়ের সম্বন্ধ করে বর পাওয়াই যাবে না। মদ খেলে তো কথাই নেই। যদিও যৌনবস্তুস্বরূপ মেয়েদের পোশাক-প্রসাধনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে বিরাট বাণিজ্য, আচ্ছাদন আর আভরণের ব্যাপারে মেয়েদের স্বাধীনতা খুবই কম। পুরুষমানুষ খালি-গা হয়ে লুঙ্গি পাজামা পরে আরাম পেলে তাকে তা পেতে কেউ বাধা দেয় না, তাদের রোমশ শরীর যতই দৃষ্টিকটু হোক না কেন। কিন্তু নারীদের যে পথে হাঁটতে হয় তা সংকীর্ণ, যেন ক্ষুরস্য ধারা। একটু এদিক হলেই পোশাকটা অশালীন হয়ে গেল। মেয়েটা অসভ্য হয়ে গেল। একটু ওদিক হলেই মেয়েটা বড়ই গাঁইয়া—সাজপোশাক করতেও শেখে নি। এই ইডিয়োলজি অনুসারে নারী এমনই এক বস্তু যার পবিত্রতা পান থেকে চুন খসলেই নষ্ট হয়ে যায়। আগে দশ-বারো বছর বয়সের মধ্যে মেয়ের বিয়ে না হলে সে হয়ে যেত 'অরক্ষণীয়া'। আজ তা না হলেও একটি মেয়ের একবার বিয়ে ভেঙে গেলে তার কেন, তার বোনেরও সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোনো মেয়ে ধর্ষিতা হলে সমাজ তাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে দেয়, যেন অপরাধটা তারই।

এই যে ভাবধারা, তার প্রভাব আর পরাক্রম এতই বেশি যে অনেকদিন যাবৎ অনেক সাহসী নারী এককভাবে এবং সংঘবদ্ধভাবে তার সঙ্গে সংগ্রাম করলে তবেই তাকে খানিকটা ঘায়েল করা সম্ভব হবে। পাশ্চাত্ত্য জগতেও নারীরা সমজাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার ফলভাগী ছিল। কিন্তু গত কয়েক দশকে সেখানকার আধুনিকমনস্কা নারীরা বিপুল বিশাল ব্যাপক আকারের আন্দোলন করে সমাজকে তোলপাড় করে দিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক অত্যন্ত গভীর এবং সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সমাজ-জীবনে আনতে পেরেছে। সেদেশের নারীদের সঙ্গে মিশলে আজকাল মনে হয় যেন মানুষের সঙ্গেই মিশছি, যা আমাদের দেশে খুব কম সময়ই মনে হয়। নারীদের সভাসমিতি যে অনেক প্রতিষ্ঠিত হয় নি তা নয়, কিন্তু তাদের চিন্তার আর কাজের পরিধি এখনও পর্যন্ত রয়ে গিয়েছে নিতান্তই সীমিত। বধূহত্যার ঘটনা নিয়ে সভা করা হচ্ছে, প্রতিবাদ করা হচ্ছে। কিন্তু যারা করছে তারা যে নিজেরাই অর্ধমৃত তা তারা জানে না। পণপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক নারীসংগঠন সোচ্চার। কিন্তু পণ দেওয়া-নেওয়া হচ্ছে তো প্রায় প্রতিটি বিবাহেই। এই সভাসমিতির সদস্য মহিলারা সেই বিবাহ-অনুষ্ঠানে যোগদান করছে না, ভূরিভোজন করে পান চিবোচ্ছে না, এমন তো শুনি নি।

সুতরাং ভারতবর্ষে নারীমুক্তি এখনও দূর অস্ত্‌। তাই বলে হতাশ হওয়ার কোনোই কারণ নেই। সংঘবদ্ধ কোনো আন্দোলন দানা না বাঁধলেও বহু তরুণ-তরুণীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যারা সর্বান্তঃকরণে যে ভাবধারাটির কথা বললাম তাকে ঘৃণা করতে শিখছে। এই তরুণ-তরুণীরা এখনও কিছু করে উঠতে পারছে না। কিন্তু আশা করা যায় যে ধীরে-ধীরে হলেও, অল্প-অল্প করে হলেও, ওই দানবাকার প্রতিক্রিয়াশীল ইডিয়োলজির আওতা থেকে এই তরুণ-তরুণীরা বেরিয়ে আসতে পারবে। অতীতে প্রগতি সম্ভব হয়েছে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও অবশ্যই তা হবে।

উল্লেখসূচী

[১] পান্থজনের সখা, আবু সয়ীদ আইয়ুব, পৃ ১০৯

[২] পূর্ববৎ, পৃ ১২৫

[৩] পূর্ববৎ, পৃ ১০৯

[৪] মেয়েদের ভালবাসার অধিকার, সুতপা ভট্টাচার্য, প্রতিক্ষণ অকটোবর ১৯৮৩

[৫] কবিতা সিংহের একটি কবিতা থেকে

[৬] সুতপা ভট্টাচার্য, পূর্ববৎ

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

সেলিনা হোসেন

দুপুরের আগেই তোরাব আলীকে আনা হয়। ঘটনা শুনেই সব বুঝে ফেলে তোরাব আলী, সুজাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। ক্লান্ত, ঝোড়ো কাকের চেহারা ; রক্তচক্ষুতে প্রতিশোধের আগুন। রজবের বুক কাঁপে, সুজা কখন হিম হয়ে যায়—জোর করে আর কত শক্তি অর্জন করতে পারে। নাসির নির্বিকার, দেয়ালে ঠেস দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। বিকেল নাগাদ ওরা ছাড়া পায়। কী আপোস-রফা হয়েছে ওরা জানে না। বাজারের ভেতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে নাসির যে কোন্ ফাঁকে পালিয়েছে ওরা টের পায় না। পেছন থেকে ওরা যখন খোঁজাখুঁজি করে তোরাব আলী গম্ভীর স্বরে বলে, হিতে কার মানুষ?

—মনসুর আলীর।

আর কথা নেই। ঘাটে নৌকা বাঁধা। তিনজনে নৌকায় ওঠে। সুজা আর রজব নৌকা ছেড়ে দেয়।

—বহুত খেল দেখাইয়, সুজা মিয়া। এখন তৈয়ার হ।

—ক্যা? দোষডা কী?

—কিচ্ছু ন, কিচ্ছু ন। তোঁয়ারা একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা। ত জানি রাইখো, আই হাতে ন মাইরগাম, মাইরগাম ভাতে।

—মারি তো রাইখ্যানই। ক্ষমতা থাইলে মানুষে বহুত কিছু পারে। আঁরা ছোডলোকেরা তো মরিবর লাই জন্মি। আঁরার আর সুখ-দুখ কী?

তোরাব আলী সুজার কথার উত্তর দেয় না, নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, যা আছে তা মনেই থাকে। সে নকশা একদম শাদা, কোনো ধোঁয়াটে ব্যাপার নেই।

খন্দকারকে সভাপতি করে মালেক সমিতি বানিয়ে ফেলে। সব জেলের নৌকা হবে, জাল হবে—মূল শ্লোগান এটা। লোকজনের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। নিজের ঘরের সঙ্গের বাড়তি জায়গাটুকুতে চাল উঠিয়ে একটা ঘর বানিয়েছে। সন্ধ্যায় মাদুর বিছিয়ে সবাই ওখানে বসে। আলাপ-আলোচনা হয়, কিভাবে এগুবে তার পরিকল্পনা চলে। তোরাব আলীর পাশের লোকেরা পেছন থেকে টিটকারি দেয়—হালায় উগ্যা নেতা হইয়ে। হিতার নেতা-গিরি ছুটাইয়াম। মালেক উপেক্ষা করে। এখন কাজের সময়, বিবাদ এড়াতে চায়। কখনো ওদের বিরূপ মন্তব্যে

হেসে ঘাড়ে হাত রাখে—ভাই, আই কি তোঁয়ারর কথা ন কই না?

—য। কত নেতা দেইলাম। কাম শ্যায হইলে কারো দ্যাখা ন মিলে।

মুখঝামটা দিয়ে চলে যায় ওরা। মালেক কষ্ট পায়। হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দূরে চলে আসে। এখনো মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে নি। এরা ভাবতেই পারে না যে গাঁটের পয়সা খরচ করে কেউ পরের উপকার করতে পারে। একদিন তোরাব আলী ডেকে পাঠায়—হুনলাম তুই নেতা হইয়াস?

মালেক চুপ করে থাকে। তোরাব আলীর মনোভাব আঁচ করার চেষ্টা করে।

—নেতা হয়নের পর হাঙর ধরবি তো? না হুদা মিটিং করিবি?

ও খোঁচা উপভোগ করে। কথার জবাব দেয় না।

—ব্যাক জাইলার নৌকা হইলে, জাল হইলে, মহাজন ন থাইব কেউ, না?

—না, ন থাইব। মালেক এতক্ষণে মুখ খোলে।

—ভালা, খুব ভালা। তোর আপিসত আঁরে অগ্যা কাম দিস! হা-হা হাসিতে ভেঙে পড়ে তোরাব আলী। মালেক শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে পায় বাদলকে —গোয়াল থেকে গোরু বের করছে। তোরাব আলীর হাসি শুনে থমকে দাঁড়ায়, মালেকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। বাদলের মা সুস্থ হয়েছে। কক্সবাজার থেকে ফিরে সোজা তোরাব আলীর আশ্রয়ে এসেছে। ও আর সাগরে যাবে না। আকাশ-পানির সীমানা দেখবে না—হাজার-হাজার রূপালিমাছভরা জাল টেনে তুলবে না। ও ঘরের কাজ করবে, তোরাব আলীর ফাইফরমাশ খাটবে, হুকুমের দাস হয়ে থাকবে। জোয়ান ছেলে বাদলের যা হবার কথা ও তা হতে পারবে না, এই ঘানি টানতে-টানতে জুড়িয়ে যাবে।

তোরাব আলীর হাসি থেমে গেলে আচমকা প্রশ্ন করে, সুজার পোয়া-ছা কউগা?

—দশউয়া।

—মাল আল্লা।

মালেক উন্মুখ হয়ে তোরাব আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—জিগ্যাইল্যান ক্যা?

—অ্যানে মনত হৈল। বড়ডা কামাই করতে পারে না!

—না।

—আহা রে?

তোরাব আলীর কৃত্রিম সহানুভূতি মালেকের কানে খট করে বাজে। ওর মনে হয় কোথায় যেন কী ঘটতে যাচ্ছে। এটা তারই ইঙ্গিত।

—যাই, নামাজ পড়ি, আছড়ের আজান দিয়ে। তোরাব আলী কাছারিঘরে চলে যায়! বাতাসে চটির ফটফট শব্দ ভাসে। ওটা যেন কার ঘাড়ে পড়ছে। এই অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গে ও শক্ত হয়ে যায়—এখন থেকে এইসব রুখতে হবে। এখন থেকে শ্লোগান দিতে হবে যে জোয়ান ছেলে-দের ক্রীতদাস বানানো চলবে না ; ঘাড় ধরা চলবে না। ও ভেড়ির শেষ মাথায় এসে বসে, নারকেলগাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে দেয়। তখন বাদল এসে পাশে দাঁড়ায়।

—মালেক ভাই!

—ক।

—আই এখন কী কইরগাম?

—এখানে কাম করন ন পড়িব।

—ক্যা?

—তোরে চাকর বানাইয়ে।

—মালেক ভাই! বাদলের আর্তকণ্ঠের ডাকে মালেকের বুক কেঁপে ওঠে। ওর চোখ ছলছল করছে।

—তুই চ, তোর কামের ব্যবস্থা করি।

—ক্যানে? মহাজনর কাছে তো বান্দা। টেঁয়া শোধ ন কইরগাম না?

—না।

—আরে মারি ফালাইব। বাদলের ভীরু শঙ্কিত দৃষ্টি, মালেকের দিকে চাইতে পারে না।

—বাদইল্যা! মালেকের ধমকে ও আরো বিব্রত হয়।

—আঁরে তোঁয়ারা মারি ফ্যালো, মালেকভাই।

বাদল ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। মালেক শক্ত করে ঘাড় চেপে ধরে, সহানুভূতিতে নয়—রাগে।

—মাইয়ামানষের লান ন কান্দিস! দড় হ।

দূর থেকে তোরাব আলী হাঁক দেয়।—ওই বাদইল্যা! প্রভুর ডাক শোনার সঙ্গে-সঙ্গে ও উঠে দাঁড়ায়।

—তুই ন যাবি, বাদইল্যা।

—মালেকভাই, তোঁয়ার কথা আঁই হুনিত ন পাইরগ্যম।

—আঁরা সমিতি করির, তোর লাই ফাইট কইরগ্যম।

—আঁই যাই, মালেকভাই।

তোরাব আলীর দ্বিতীয় ডাকে ও আর দাঁড়াবার সাহস পায় না। দৌড়ে চলে যায়। মালেক স্পষ্ট দেখতে পায় তোরাব আলী ওর কান ধরে টানতে-টানতে ঘরে নিয়ে গেল। ওর মন খারাপ হয়ে যায়। বাদল ওর সমিতির ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারে নি। ও হাঁটতে-হাঁটতে সুজার বাড়িতে আসে। সুজা গোলপাতা দিয়ে ঘরের চাল ঠিক করছে। বাড়তি কামলা ডাকে নি, ছেলেমেয়েরাই বাপকে সাহায্য করছে। ও দাঁড়িয়ে দেখে, দৃশ্যটা ওর ভালো লাগে। ওরা কী সুন্দর সবাই মিলে কাজ করছে, নিজেদের কাজ নিজেরাই সারছে। ও তো চায় জেলেপাড়ার প্রতিটি ঘর এমন হোক—এমন গোছানো, পরিপাটি, কর্মঠ। সবাই মিলে অভাব যেন রুখতে পারে। ঘরের চালের ওপর সুজা, ও রান্নাঘরে কাঞ্চনের কাছে যায়। অনেকদিন পর কাঞ্চনের পরনে নতুন শাড়ি। এই বাড়ির পরিবেশ অন্যরকম হয়ে গেছে। সবচেয়ে ছোটো ছেলেটি জামা না পেলেও একটি প্যানট পেয়েছে। সুজা কবে এত সব কেনাকাটা করল? ও পিঁড়ি টেনে কাঞ্চনের পাশে বসে।

—কী রান্ধর, ভাবি?

—পটলা কউগা তালিয়ামাছ আইন্যে। লাল শাক দি রাইন্ধি। খাইবা না?

—না। আঁই ন গেলে মা আবার বই থাকব। তোঁয়ার শাড়িডা তো সোন্দর।

কাঞ্চন মৃদু হাসে।

—গোলপাতা কত করি কিন্যে?

—কইত ন পারি। গত দুই বছর ধরি তো ঘরত পানি পড়র। এইবার ন সারাইলে আর ন চলের। পোয়াছার অসুখ ন ছাড়ে।

—ভালাই কইরগ্য। হাতত য্যাঁতে টেঁয়া আছে ঘর ন ছাইলে কি হয়!

—সালেক ভাইয়র কী হইয়ে? ছাড়া পাইয়ে নি?

—হিতার কথা ন ভাইব্যে—হিতার লাই হিতার শ্বশুর আছে। টেঁয়া দি ব্যাক ঠিক করি ফালাইব।

—সালেক ভাই কইল হিতার টলারত কাম করে অগ্যা ভালা পোলা আছে, হিতার লগে রূপার বিয়া দিব। আঁর কয়াল খারাপ ন হইলে কি সালেকভাই অ্যান কাম করে! এখন কত দিনে যে কী হইব!

—অত চিন্তা কী, মাইয়া তোঁয়ার বেশি ডর ন হয়।

—কী যে কও। আঁর তো মোডেও গুম ন আইয়ে। তুঁই অগ্যা পোয়া চাও না মালেকভাই? জুলেখা মরার পরতুন আঁই বেহুঁশ। কঁত্তে যে কী হয়?

কাঞ্চন তরকারির হাঁড়ি নামিয়ে ভাতের পাতিল দেয়। ছেলেমেয়েরা হৈ-চৈ করে ঘরে ফিরছে, সুজা নেমে এসেছে ওপর থেকে। আজকের মতো কাজ শেষ, আবার কালকে ধরবে।

—আইজ আর শ্যায ন হৈল, কাইল শ্যায কইরগ্যম।

সুজার ভেতর নতুন উদ্দীপনা। হাতে টাকা আছে, তাই যৌবন ফিরে এসেছে, কাজের স্পৃহা বেড়েছে। মুখহাত ধুয়ে রান্নাঘরে এসে বসে।

—নিজেরাই য্যাঁতে পারি হ্যাঁতে আর কামলা রাখিয়ারে কী হইব?

—ঠিক, ভালা কইরগ্য। ত ঘরডা কাইলই শ্যায করি ফালাইও। দেরি ন কইরগ্য।

—কথাডা ক্যা কইলি?

—অ্যাঁতে কইলাম। মনে আসিল ত্যাঁতে।

মালেক উঠে চলে আসে। সুজা পিছু ছাড়ে না। খানিকটা পথ আসে।

—তোরাব আলীর বাড়িত ন গিয়ে না?

—হ।

—কী কইয়ে?

—কিছু না।

সুজা দাঁড়ায়, আর এগোবে না। মালেকও দাঁড়ায়, উশখুশ করে।

—আঁর ঘরডা সোন্দর ন দেহায়?

—হ। টেঁয়া ন ভাঙাইও? কত টেঁয়া পাইয়্য?

—বহুত। রূপার লাগি অগ্যা পোলা চ। মাইয়াডার বিয়া দিয়াম।

—দেইখ্যাম।

—বাদল ন আইস্যে?

—আইস্যে।

মালেক আর দাঁড়ায় না। বিদায় নিয়ে চলে আসে। সুজা ঘরে ফেরে। মাথায় নতুন পরিকল্পনার ছক। ঘরের নতুন ছাউনি, ছেলেমেয়েদের কাপড়, মেয়ের বিয়ে ইত্যাকার আনন্দদায়ক চিন্তায় হৃদয় উৎফুল্ল।

মালেক সাফিয়ার বাড়ির কাছে চলে আসে। এদিকে এলে একবার এখানে না এসে পারে না। কী যে অদৃশ্য টান! উঠোনের ঝাঁপ খোলা। জয়গুন বারান্দায় বসে আছে। সেই জ্বরের পর থেকে শরীর ভেঙে গেছে। এখন আর বেশি কাজ করতে পারে না। ঘরেই থাকে। মালেককে দেখে কাছে ডেকে বসায়। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

—হুনলাম তুঁই সমিতি করর, বাবা? খুব ভালা। আঁই তোঁয়ারে দোয়া করি। আল্লা তোঁয়ারে ডর কইলজা দিয়ে মানুষর লাগি কাম করর। হোন বাবা, টেঁয়াপয়সা থাইলেই ক্যাল ন হয়, মানুষের লাগি দরদ আলাদা জিনিস, ব্যাকের পরানে এই দরদ ন থায়।

একটানা কথা বলে হাঁপিয়ে যায় জয়গুন। কথাগুলো মালেককে স্পর্শ করে। জয়গুনের আন্তরিকতায় ও যেন নতুন শক্তি পায়, সঙ্গে কাজের উদ্যম এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জেতার জোর।

—চাচী, আপনের শরীল ক্যান?

—ভালা না রে, বাবা। এই আছি এই নাই। বুড়ি বড়ো করে শ্বাস ফেলে—তয় কথা কী জান, চিন্তা মাইয়াডার লাগি।

—ডর মাইয়ার লাগি চিন্তা কী?

—জামাইডা তো মানুষ ন, বাবা। মানুষ হইলে তো চিন্তা ন করি। এখন কয়দিন ধরিয়ারে জুয়ায় হারি আইস্যে আর সাফিয়ার লগে মাইরপিট করের। মায়ের পরানে ন সয় বাবা!

জয়গুনের কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে যায়, চোখের জল মোছে।

—তোঁয়ার লান সোনার পোলা থুইয়ারে—

—আঁই এখন যাই, চাচী।

ও ত্বরিত উঠে দাঁড়ায়। জয়গুন খপ করে হাত চেপে ধরে।—হোন, নিজের কথা জোর দি নিজেরই কওন চাই, বাবা। নিজেরডা নিজেরই আদায় করা লাগে।

মালেক জয়গুনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বয়সের ভারে কুঁচকে গেছে চামড়া। অসংখ্য রেখা সেই চেহারায়। ওর বুকটাও অমন আঁচড়ভরা। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় ভারাক্রান্ত এবং বেদনার্ত। জয়গুন যে অভিজ্ঞতা ষাট বছরে অর্জন করেছে ও সেটা বত্রিশ বছরে পেয়েছে। ও কি জানে না জোর করে আদায় না করলে কেউ দেয় না, সেজন্যই তো সমিতি। কিন্তু যেখানে জোর খাটে না, সেখানে কী করবে? সে যন্ত্রণা বয়ে বেড়ানো ছাড়া কী উপায় আছে? জয়গুন ওর হাত ছেড়ে দেয়।

—তোঁয়ার মা ক্যান আছে, বাবা?

—ভালা।

—সাফিয়া যে কই গেল? পানি তুলিত গিয়ে কঁত্তে, এখনও ন আইস্যে। জয়গুন যেন নিজেকেই কৈফিয়ত দেয়।

—যাই, চাচী।

—আবার আইস্যো, বাবা।

মালেক নাফের পাড়ে এসে দাঁড়ায়, ওর প্রিয় জায়গা। মন খারাপ লাগলে এখানে এসে বসে, কিছু স্বস্তি, কিছু আরাম পায়। মানুষের কোলাহলের বাইরে নির্জন প্রকৃতি এমন করেই সঙ্গ দেয়। কথা বলে না, কাছে ডাকে না, সোহাগ করে না, তবু খুব কাছের মনে হয়। ও হাত-পা ছড়িয়ে ঘন সবুজ ঘাসের ওপর চিতপাত হয়। জয়গুন ঠিকই বলেছে, আদায় করে নিতে না জানলে কেউ দেয় না। সাফিয়ার ওপর ও জোর করে নি, ভালোবাসার জোরে ওর ঘৃণা। ও ঘৃণা নিয়েই পরাজিত মানুষ হতে রাজি। ওর নিজস্ব ধারণা আছে। ও বিশ্বাস করে যৌনচেতনায় শৃঙ্খলাবোধ না থাকলে সে জীবনযাপন ইতর জীবনের পর্যায়ে নেমে যায়। সাফিয়া এখন তেমন একটা জীবনযাপন করছে। ওর কি আকাঙ্ক্ষা মিটেছে? না কি আরো বাকি আছে? বন্ধুরা কখনো ওকে ঠাট্টা করে। মেন্দা বলে গাল দেয়। ওর কিছু এসে যায় না। ইতর জীবনের পৌরুষে ওর আকাঙ্ক্ষা নেই। বরং এই পরাজয় সহনীয়, গ্লানিমুক্ত এবং নির্মল। অন্তত মানুষ হিশেবে তো ও খাটো হয়ে যায় নি। যারা মানুষ হিশেবে খাটো হয়ে যায় তারা এই সমাজের সবচেয়ে অসামাজিক জীব। বেশিরভাগ লোকই এটা বুঝতে পারে না বলেই এত গলদ।

মালেকের চোখ জড়িয়ে আসে। অসময়ে ঘুম আসতে চায়। কেবলই চোখের সামনে জয়গুনের মুখ ভেসে ওঠে। আঁচড়কাটা মুখের চামড়া, গালভাঙা চোখের

দৃষ্টি বড়ো নির্মমভাবে সত্য কথা বলেছে। ওর জন্যে জয়গুনের যে আক্ষেপ আছে আজ বড়ো সরাসরি সেটা প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের শেষবেলায় জয়গুন এখন সাহসী কথা বলার ক্ষমতা রাখে। বুকটা তোলপাড় করে—জয়গুন ওকে সোনার ছেলে বলেছে। ও এই অসময়ে ঘুমুতে চায় না, মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে বসে। মানুষ হিসেবে যেন কোনোদিন খাটো না হই। ও অনেকখানি হেঁটে এসে থমকে দাঁড়ায়। মানুষ হিসেবে যেন কখনো খাটো না হয়ে যাই—এই কথাটা মগজের প্রতিটি বিন্দুতে প্রোথিত হয়ে যায়।

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই তোরাব আলীর বাড়িতে হইহই পড়ে যায়। সাংঘাতিক ডাকাতি হয়েছে। মুখ-চোখ-বাঁধা অবস্থায় উঠানে পড়ে আছে বাদল, গোয়াল-ঘরের ঘুঁটিতে খলিল বাঁধা। বড়ো ঘরের দরজা ভাঙা। থানায় খবর গেছে। পুলিশ এসে পড়ল বলে। আশে-পাশের লোকজনে বাড়ি ভরতি হয়ে গেছে। কাছারিঘরে গুম হয়ে বসে আছে তোরাব আলী। দুই লক্ষ টাকা ক্যাশ নিয়েছে। জিনিসপত্র কিছু খোয়া যায় নি। ভোর-বেলাই মাছ ধরতে বের হয় আলেক। লোকের মুখে খবর শুনে ও দৌড়ে এসে মালেককে খবরটা দিয়ে যায়।

—তুই নিজের চক্ষে দেখি আইস্যস না!

—আঁর হাউন নাই, তুই য।

—তুই ন যাবি?

—না, মাইজভাই। বেলা বাড়ি গেলে আর মাছ ন পাইয়্যম। তোরাব আলীর বাড়িত ডাকাতি হইলে আঁরার কী? আঁর কাম মাছ ধরা।

ও ঘাড়ের ওপর জাল ফেলে নির্বিকার চলে যায়। ঘরের কোণে মা সুর করে দোয়াদরুদ পড়ছে। মালেক কান পেতে শোনে, শুনতে ভালো লাগে। বড়ো শ্রুতিমধুর লাগে মার কণ্ঠ। সকালটা পবিত্র মনে হয়। ও বালিশে মুখ গোঁজে। তোরাব আলীর বাড়িতে রয়েসয়ে যাওয়াই ভালো। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে সুজা আসে।

—মালেক, খবর হুনাস না?

—হুনি তো।

ও বড়ো করে হাই তোলে। আড়িমুড়ি ভাঙে। মার কণ্ঠ থেমে গেছে। আজকের সকালটা একটু অন্যরকম। সুজা উত্তেজিত, ঘটনায় অবিশ্বাস।

—আঁর বিশ্বাস ন হয়, মালেক?

—ক্যা?

—অ্যাত সাহস কনের?

—সাহস ন হৈব ক্যা? মানুষের সাহস বহুত বাড়িয়ে। আপনেরও সাহস বাড়িসো সুজাভাই!

সুজা গুম হয়ে থাকে। মালেকের এমন সরাসরি আক্রমণে বিব্রত বোধ করে। তারপর একরকম জোর করেই বলে, সাহস ন করিলে বাঁচনর পথ নাই।

—আই তো হেইডা কই, মানুষে ডাকাতি করিবো অবিশ্বাস ন হয় ক্যা আপনের? এখন ব্যাকই সম্ভব।

—ও বাবা সুজা, তোর পোয়া-ছা ক্যান আছে রে?

এতক্ষণে মার কথা খেয়াল হয় ওর। দ্রুত গিয়ে মার পাশে বসে।

—তুই ক্যান আছ, মা?

—ভালা, বাজান।

কতদিন মার পাশে বসা হয় নি। এখন আর মার কথা ওর তেমন মনে হয় না।

—তোঁয়ার ছাউনির কাম শ্যাষ হইয়ে না, বাবা?

—না, মা। আইজ শ্যাষ কইরগ্যাম।

—চ বড়োভাই, আপনের ঘরের কাম শ্যাষ করি ফেলি।

—এখন থাক। ভালা ন লাগে।

—বেয়ানে কাম করনই ভালা, রোদ কম থায়ে।

—না, এখন থাক। কাম কম, করি ফেলিয়াম।

—হিতারে পানতা দে, মালেক।

রাতের তরকারি দিয়ে সুজাকে এক-সানকি পানতা দেয় মালেক। দুখার মা হাফিতে-হাফাতে ঢোকে।

—দেরি করিলা ক্যা, দুখার মা?

—দেখি আস্যি তোরাব আলীর বাড়ি।

—পুলিশ ন আইয়ে?

—না।

—তোরাব আলী কী কয়?

—কয় কনে ডাকাতি করের সব দেইখ্যে, বেগুনেরে চিন্যে। দারোগার কাছে নাম কই দিবো।

—কও কী, দুখার মা?

—হ ঠিক। তোরাব আলী রাগে বেহুঁশ।

সুজা ভাত খেতে পারে না, বিষম খায়। মালেক পানি এগিয়ে দেয়। ওর অস্বস্তি বাড়ে, বুকের মধ্যে

ভয়ের কাঁপন। প্রথম থেকেই ব্যাপারটায় ওর অবিশ্বাস। এখন দুখার মার কথায় ঝাপসা অবস্থা কেটে যেতে থাকে। ও কোনোরকমে খাওয়া শেষ করে।

—চ মালেক দেখি, দেখি আসি।

—চলেন।

দুজনে বেরোয়।

—ও বাবা, ভাত ন খাবি?

—আসি খাইয়াম, মা।

পথে ও সুজাকে চেপে ধরে।

—আপনের কি মনত হয়, বড়ভাই?

—মনত হয় ঘটনা সাজানো। তোর কী মনত হয়?

—যাইয়ারে দেখি অবস্থা।

বাঁধের ওপর তাহের আর রজবের সঙ্গে দেখা হয়। দুজনে ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী দেখিলি?

—দেখ্যি বাদল আর খলিল বান্দা। দারোগা না আসিলে হিতারে কেউ ন খুলিব, মহাজনর হুকুম।

দুজনে হাসিতে ভেঙে পড়ে। ওরা দারুণ মজা পেয়েছে। তোরাব আলীর নাজেহালে খুব খুশি।

—মহাজন তোঁয়ারে কিছু ন জিগায়?

—কী জিগাইব?

ওরা বিস্ময় প্রকাশ করে।

—ন জিগায় আঁরা ডাকাতি করির না?

দুজনে হাসতে থাকে। এমন অবাস্তব, উদ্ভট চিন্তা ওদের মাথায় ঢোকে না। কিন্তু সুজার আশঙ্কা কাটে না। সেই অন্ধকার ছাতে নৌকার ওপর বসে চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলেছিল তোরাব আলী। এখনো তা সুজার বুকে গেঁথে আছে। তাহের আর রজব বাজারের দিকে চলে যায়, দুজনে ডাকাতির ঘটনার তুমুল আলোচনায় ব্যস্ত। কিছুটা পথ এগোতেই মালেক সুজার হাত টেনে ধরে।

—ল, আপনের ঘরর কাম শ্যাষ করি ফেলি।

—না, এখন থাক। কামত মন ন বসিব।

সুজা কথা না বাড়িয়ে দ্রুত পা বাড়ায়। ও তোরাব আলীর মুখোমুখি হতে চায়, আঁচ করতে চায় কিছু। কাছারিঘরের সামনে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, তোরাব আলী উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকাতির বর্ণনা করে। গলা কখনো খাদে নেমে যায়, কখনো উঁচুতে ওঠে, কখনো রুদ্ধ, কখনো আবেগে থমথমে। সেই চমৎকার বর্ণনায় গাঁয়ের লোকের কারো-কারো চোখে পানি আসে। যারা ডাকাতি করেছে তাদের সবাইকে চিনেছে, পুলিশের সামনে নাম বলবে। পেছন থেকে কে যেন চিৎকার করে, এখন কন, আঁরা তক্তা বানাই ফেইলগাম।

—না, কাম নাই। নিজেরর হাতে আইন লন ভালা ন। আইনের লাগি সরকার ন আছে ন?

—ঠিক, ঠিক কইয়েন।

অনেকেই সমর্থন করে। সুজা বুঝে ফেলে তোরাব আলী এতক্ষণের বক্তৃতায় গাঁয়ের লোকের মন কেড়েছে, জনমত এখন তার পক্ষে। মালেক ঠেলেঠুলে সামনে এগিয়ে আসে। ওকে দেখে তোরাব আলী সখেদে বলে, এতদিনে দেখিবারে আইলি? হিতারা যে আঁরে পরানে ন মারে এই তো বেশি।

—কী করিবেন, ব্যাকই আল্লাহ্‌র হাত। ডাকাইতরা গায়ে হাত ন তুইল্যে তো?

—না, ইজ্জত ন হারাই। যা চাইয়ে দিয়ে দি।

—কী আইনো সাথে? বন্দুক?

—অগ্যা ডর রামদা আছিল, কুড়াল আছিল। বন্দুক ন দেখি। পিস্তল আছিল কিনা ন জানি।

—অ্যাতে ডাকাতি এই গাঁয়ে আর ন হয়। মানুষের সাহস বাড়ি গিয়ে।

—ঠিক কইয়ো। মানুষের সাহস বাড়ি গিয়ে।

তোরাব আলী চিবিয়ে-চিবিয়ে মালেকের কথার পুনরাবৃত্তি করে। মালেক চমকে ওঠে। সকলেই বুঝতে পারে যে তোরাব আলীর কণ্ঠ কেমন বদলে গেল। উপস্থিত সবার মধ্যে অস্বস্তি। সুজা ভিড়ের পেছন দিক থেকে কেটে পড়ে। তোরাব আলীর মুখোমুখি হবার ইচ্ছে নেই।

তখন থানা থেকে দারোগা-পুলিশ আসে। তোরাব আলী ব্যস্ত হয়ে উঠলে মালেকও বেরিয়ে আসে। সুজার বুকের মধ্যে কাঁটা, কেবলই খোঁচায়, কিছুই ভালো লাগে না। ভেড়িবাঁধ বেয়ে সমতলে নামতেই মালেক ওর মুখোমুখি হয়।

—আপনে টেকনাফ চলি য, বড়ভাই?

—পলাইয়াম?

—আর কী করিবা? ডাকাতি মিছা কথা। তোরাব আছী কিচ্ছা বানাইয়ে।

—ইবা আই আগেই বুজ্জিজ্য।

সুজা অকস্মাৎ মালেকের হাত চেপে ধরে—আর পোয়া-ছারে দেইস।

মালেক কথা বলতে পারে না। বুক ভার। ও একটা সমিতি করেছে জীবনের নিরাপত্তার জন্যে। কিন্তু কিভাবে নিরাপত্তা দেবে? ওর হাতে ক্ষমতা নেই, অর্থ নেই। আছে কেবল দরদ, ভালোবাসা, গুটিকয় মানুষের বাহুবল। এই দিয়ে কি বড়ো কিছু হয়?

মাথার ওপর রোদ বাড়ছে চড়চড়িয়ে। বাতাসে ভ্যাপসা গরম। সুজার চোখে জল। মালেকের হাত দুটি মুঠি করে ধরে রাখে। ও বাঁচার জন্যে পথ হাতড়ে ফিরছে, মরণকামড় দিয়েছে তোরাব আলীর গায়ে। বাঁচতে পারল কই?

ঘরে ফিরে অবসন্নের মতো শুয়ে থাকে সুজা। কাঞ্চন যখন দুপুরের খাবার জন্যে ডাকে তখন ঘরের দরজায় পুলিশ আসে। বেলা দুটোর দিকে তোরাব আলীর বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগে সুজা, তাহের আর রজবকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।

বিকেলে মালেকের নেতৃত্বে মিছিল বের হয় জেলেপাড়ায়। সমিতির প্রথম পদক্ষেপ। বানানো ডাকাতি কেস বাতিল করো, তোরাব আলীর দমননীতি চলবে না। সর্বত্র উত্তেজনা। সফল মিছিল হয় ওদের। এত লোক সাড়া দেবে, ভাবতেই পারে নি মালেক। আনন্দে চোখে জল আসে। প্রয়োজনে মানুষ একত্র হয়। দরকার এই শক্তিকে কাজে লাগানো। তোরাব আলীর বাড়ির সামনে উত্তাল হয়ে ওঠে জনতা। তছনচ করে ফেলে কাছারিঘর। ওদের তিনজনকে ফিরিয়ে আনার জন্যে দাবি জানায়। চাপে পড়ে তোরাব আলী রাজি হয়। সকলে আনন্দ-উল্লাসে ভেড়িবাঁধ ঘুরে সমিতির সামনে এসে থামে। বক্তৃতা করে মালেক—আবেগে উত্তেজনায় কণ্ঠ গমগম করে। মানুষ অধীর আগ্রহে শোনে, মুহুর্মুহু করতালিতে অভিনন্দন জানায়।

এর মাঝে বিকেল ফুরোয়, আঁধার নামে। একে-একে চলে যায় সবাই। পরবর্তী কর্মপন্থা কী হবে সেটা ঠিক করার জন্যে গোল হয়ে বসে ওরা। কী করা যায়, কী ভাবে এগুলে কাজ উদ্ধার হবে—এসব ভাবতে-ভাবতে রাত গভীর হয়। কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারে না ওরা। কাল আবার বসবে। যে যার বাড়ির পথ ধরে। মালেক বুড়ো তালুকদারকে এগিয়ে দিয়ে আসে। রাত অনেক হয়েছে। জেলেপাড়া নিঝুম। ফেরার পথে গা ছমছম করে ওর। বেতঝোপের আড়াল থেকে তিনজন লোক সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখে কাপড় বাঁধা, অন্ধকারে চেনা যায় না। মালেক প্রস্তুত ছিল না, ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। দমাদম ঘুঁষি পড়ে। নিজেকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করে ও লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

—আর ন মারিস, মরি যাইত পারে। জানে মারিবার মানা আছে মহাজনর।

—হ, আবার একডা ঝামেলা। আইজ যা দিলাম, ইতেই ছ মাসের ঠেলা। চ, অন যাই।

মালেক চেতনে-অচেতনে ওদের কথা শোনে। পাছার ওপর আর-একটা লাথি পড়ে। মনে হয়, শরীরে কোনো অনুভূতি নেই, চারদিকে অন্ধকার।

—এই হিক্ষায় হালার যদি নেতাগিরি ছুটে ইতে বুইজাম বাপের বেডা।

কখন ওরা চলে যায় ও টের পায় না, কিছুই মনে থাকে না।

পরদিন ভোরে মসজিদে যাবার পথে আব্বাস মিয়া ওকে দেখতে পায়। ডাকাডাকি করার পরও সাড়া না পেয়ে হইচই করে লোকজন ডাকে। চার-পাঁচ জন ধরাধরি করে ওকে ঘরে নিয়ে আসে। গাঁয়ের ডাকতার আসে, কাটা জায়গায় ওষুধ দিয়ে বেঁধে দেয়। দুপুর নাগাদ ও পুরো জ্ঞানে আসে। দেখতে পায় মানুষের ভিড় ওর মুখের ওপর—মুখগুলো আঁকাবাঁকা সরু রেখা যেন। কখনো নাকের মতো, কখনো বালুময় তট। হিজিবিজি স্বপ্নের ঘোরে ও কিছুই মনে করতে পারে না। কেবলই মনে হয়, হাজার হাজার লোক সঙ্গে করে ও কোথায় যেন যেতে চেয়েছিল, যাওয়া হচ্ছে না। যেতে পারছে না, সামনে পথ নেই। পথ কেটে তৈরি করতে হবে, কিন্তু ওর সামর্থ্য নেই। ওর পা কাদায় দেবে যাচ্ছে। ও পরাজিত মানুষের গ্লানি নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

—মালেকভাই? ও মালেকভাই?

একজন তরুণের কণ্ঠ। ও সাড়া দেয় না। কেবলই মনে হয় মা কেন ওকে ডাকে না, মা কোথায়? ও বুঝতে পারে না যে ও আর শুধু মায়ের ছেলে নেই, ওর কাছে এখন হাজার লোকের দাবি। ও এখন অনেক মানুষের।

—হিতারে ন ডাকিস, ঘুম যাইত দে।

কার কণ্ঠ? ও মনেপ্রাণে বুঝতে চায়, পারে না।

—তোঁয়ারা অন গোলমাল ন করিস, বাইর যা।

কার কণ্ঠ? ও ধরতে পারে না।

—আহারে, পোলাডারে এক্কেবারে শ্যাষ করি দিয়ে।

কার কণ্ঠ? ও চিনতে পারছে না কেন? আজ কি ওর ঘরে সব নতুন লোক? এত লোক কারা? কোথা থেকে এল? মালেকের মাথায় স্বপ্নের বুড়বুড়ি। হাজার বুদ্বুদ ভাঙে আর গড়ে। চারপাশে নতুন মানুষের আনাগোনা শুনতে-শুনতে ওর ঘুম পায়। মানুষের ভিড় ওর ভালো লাগছে, ওর মগজে ওষুধের কাজ করছে। ও আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সেদিন বিকেলে মিছিল আবার তোরাব আলীর বাড়িতে যায়। মালেকের পিটুনির বিচার চাই, তোরাব আলী জবাব দাও। শূন্য কাছারিঘর খাঁ-খাঁ করে। তোরাব আলীর বুড়ো মা বাবা-সোনা বলে ওদের থামায়। বলে, তোরাব আলী টেকনাফ গেছে, ফিরে এলে এর একটা বিচার অবশ্যই হবে। বুড়ির খনখনে কণ্ঠ কেউ শুনতে পায়, কেউ পায় না। তোরাব আলী নেই দেখে ফিরে আসে। ফেরার পথে কাছারিঘরের বেড়া খুলে ফেলে ওরা। ভেঙে ফেলে ঘরের খুঁটি। দুদিন মিছিলের পর সব থেমে যায়। মালেক বিছানা থেকে উঠতে পারে না। ঝিমিয়ে পড়ে জেলেপাড়ার জেগে-ওঠা মানুষগুলো।

[ক্রমশ

রাদিচের অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতি ভট্টাচার্য

প্রথমে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অনুবাদক উইলিয়ম রাদিচকে, এবং প্রকাশক পেঙ্গুইন বুকস প্রতিষ্ঠানকে। পেঙ্গুইন মডার্ন ক্লাসিকস গ্রন্থমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার যেমনই হোক একটি ক্ষুদ্র সংকলন অন্তত অন্তর্ভুক্ত হল, বাঙলা ভাষার একটু ঠাঁই হল। এই শতাব্দীর আশির দশকেও আন্তর্জাতিক কাব্যভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বল্প হলেও একটু যে স্থান আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের অনেক গর্ব, অনেক বিস্ময়। কিন্তু কিছুকাল ধরে মনে হচ্ছিল যে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের নামও বোধহয় এখন বিস্মৃত ; 'বিশ্বকবি' শব্দটা ব্যবহার করা বোধহয় কখনোই ঠিক হয় নি, এখন তো পুরোপুরি পীড়াদায়ক। একটু ক্ষোভ-অভিমানও হচ্ছিল বিদেশের বিরুদ্ধে, বিশেষত ইংরেজিভাষী বিদেশের বিরুদ্ধে। আবার মনে হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথের কতটুকুই বা অনুবাদ হয়েছে, আর সে অনুবাদই বা এমন কী হয়েছে যাতে পাশ্চাত্ত্যের স্মৃতিপটে রবীন্দ্রনাথের নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকতে পারে? ম্যাকমিলান কোম্পানি প্রকাশিত "কলেকটেড পোয়েম্‌জ্‌ আনড প্লে'জ" যে আর না ছাপাই ভালো, সে বিষয়ে অনেকে একমত হবেন।

রাদিচ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন মাত্র ৪৮টি কবিতা। ১৮৮২-১৯১৩, ১৯১৪-১৯৩৬, এবং ১৯৩৭-১৯৪১—কবিজীবনের এই তিনটি পর্বের প্রত্যেকটি পর্ব থেকে ১৬টি করে কবিতা বেছে নেওয়া হয়েছে। পর্বসন্ধি ধরা হয়েছে ১৯১৩ সালে নোবেলপুরস্কারপ্রাপ্তি, এবং ১৯৩৭ সালে রোগের আক্রমণ। মাত্র আটচল্লিশটি কবিতার অনুবাদ ইংরেজিতে রবীন্দ্রকাব্যের অনুবাদের স্বল্পতা লাঘব করে না। কিন্তু ২৩ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা আছে, এবং প্রত্যেকটি কবিতার সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা-সংবলিত টীকা আছে—সেই 'নোটস'-এর আয়তন ৫২ পৃষ্ঠা। রাদিকে যত্ন-এবং অভিনিবেশ-সহকারে কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করার জন্য, এবং বর্তমান কালের পাশ্চাত্য কবিসমাজে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণযোগ্য করে নেওয়ার প্রচেষ্টায় তাঁর আগ্রহ আন্তরিক।

নির্বাচন সম্বন্ধে

যে-কোনো চয়নিকা সম্বন্ধেই প্রশ্ন তোলা যায়—অনেক ভালো কবিতা বাদ গেল কেন, এইগুলোই বা নেওয়া হল কেন? রবীন্দ্রনাথের নিজের করা "চয়নিকা" বা "সঞ্চয়িতা"-ও তর্কাতীত নয়। সেক্ষেত্রে রাদিচের নির্বাচন যে অনেকের মনোমত হবে না, সেকথা রাদিচ জানেন। এই ৪৮টি কবিতা বেছে নেওয়ার কারণ সম্বন্ধে মুখবন্ধে (পৃ ৯) তিনি যা বলেছেন, তার ওপর আর কথা চলে না—"যে কবিতাগুলি আমার ভালো লেগেছে, আর আমি বুঝতে পেরেছি বলে আমার মনে হয়েছে, আমি সেইগুলিই অনুবাদ করতে সক্ষম, তাই করেছি।" "শেষ লেখা" গ্রন্থ থেকে কোনো কবিতা তিনি নেন নি, কারণ ওগুলির অনুবাদে তিনি নিজেকে সক্ষম মনে করেন নি।

আসলে এরকম সংকলনের সীমাবদ্ধতার প্রধান নিয়ামক গ্রন্থের আয়তনের অলঙ্ঘ্য সীমানা। পেঙ্গুইন মডার্ন ক্লাসিকস গ্রন্থমালায় গ্রন্থের আয়তন নির্দিষ্ট, তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সম্পূর্ণপরিচয়বাহী একটি সংকলন করা অসাধ্য। রাদিচ অসাধ্য সাধন করতে পারেন নি বলে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে তাঁর প্রয়াস অবহেলার বিষয় নয়।

নিজের পছন্দ এবং গ্রন্থের আয়তন—এই দু-রকম সীমানার মধ্যেও কবিতা বাছাইয়ে একটা পদ্ধতির কথা রাদিচে তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন (পৃ ৩৫-৩৬)। তিনি চেষ্টা করেছেন কোনো দুটি কবিতা যেন এক ধরনের বা এক বিষয়ে না হয়, রবীন্দ্ররচনার বৈচিত্র্য এবং গতি যেন কিছুটা বিঘ্নিত হয়, আবার গতির সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র সংকলনের মধ্যে একটি সংগতিও যেন রক্ষিত হয়। বেশ দুরূহ প্রয়াস।

সংগতিরক্ষার জন্য রাদিচ বিষয়গত মূলসূত্র হিসেবে অবলম্বন করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'তত্ত্ব (পৃ ৩৫)। প্রসঙ্গটি এক সময়ে প্রচুর উচ্ছ্বাস এবং বাগাড়ম্বর জাগিয়েছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার জন্য বেশ দায়ী। কিন্তু আমার অনুমান যে, অন্তত আমাদের দেশে বর্তমানে এ প্রসঙ্গ অস্বস্তিকর, এবং বহুচর্বণের ফলে বিরক্তিকর। এ যুগের ইংরেজ পাঠকের রুচি কী আমি জানি না, তবে সকলের কাছেই এ প্রসঙ্গ কৌতূহলোদ্দীপক হবে বলে আমার মনে হয় না।

'জীবনদেবতা'কেই মূল প্রসঙ্গ ধরে নেওয়ার ফলেই হোক, অথবা রাদিচের ব্যক্তিগত রুচির বৈশিষ্ট্যের ফলেই হোক, রবীন্দ্রনাথ যে পরাধীন ভারতবর্ষের কবি ছিলেন, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের যন্ত্রণা যে তাঁকে পীড়া দিত, সেই যন্ত্রণাবোধ এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য আকুতি যে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার উৎস অথবা পশ্চাৎপট, এ শতাব্দীর সূচনায় স্বাধীনতাসংগ্রামের নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে একটা ভূমিকা ছিল, রাদিচের সংকলন থেকে তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া শক্ত। ভূমিকায় এ বিষয়ে যেটুকু উল্লেখ আছে তা অত্যন্ত আকিঞ্চিৎকর। সন্দেহ নেই যে এই প্রসঙ্গে কবিতার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ'-বিষয়ক গানগুলিকে প্রাধান্য দিতে হয়, এবং রাদিচে গানের অনুবাদ করতে অস্বীকার করেছেন, কারণ তিনি মনে করেন যে, গান অনুবাদ করা যায় না (পৃ ২৮)। এ কথা যদি বিনা তর্কে মেনে নিই, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়—"নৈবেদ্য" গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা যথা—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য', 'এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে', 'শতাব্দীর সূর্য আজি'—একেবারে বাদ দেওয়া ঠিক হয়েছে কি? 'রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি' বা 'সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে', 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' বাদ গেছে তাই নয়, ওই ধরনের কোনো কবিতাই স্থান পায় নি। বক্সা বন্দীশিবির থেকে রাজবন্দীরা রবীন্দ্রজন্মদিবসে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন ('নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন'), আমার বিবেচনায় সেটি রুশদেশে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত বন্দী ডিসেম্ব্রিস্ট বিদ্রোহীদের উদ্দেশে আলেকসান্দার পুশকিন-এর ১৮২৭ সালে রচিত বিখ্যাত কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। দুর্ভাগ্যবশত এ কবিতাটি "চয়নিকা" বা "সঞ্চয়িতা" কোথাও স্থান পায় নি—সম্ভবত ব্রিটিশ প্রেস অ্যাকটের আশঙ্কায়। রাদিচে এটা দেখলে ভালো করতেন।

'জীবনদেবতা' প্রসঙ্গটিই সম্ভবত রাদিচের কিছু বিভ্রমের কারণ। 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতাটি (অনুবাদে নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব') 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান পেলেও মূল বাঙলাতে, অন্তত এখন, অপাঠ্য—এবং ইংরেজি অনুবাদে এক ধরনের সংকীর্ণ কৌতূহল জাগালেও, কবিতা বলে গণ্য নয়। হিন্দুদের ত্রিদেব-কল্পনা, ভাঙা মাইথলজির একটা টুকরো, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরলোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে তর্ক করা যায়, কিন্তু তাতে কবিতার উপকার হয় না।

'দেবতার গ্রাস' বাছা হল কেন? পাদটীকায় (পৃ

১৩৭) জোর দেওয়া হয়েছে দু-রকমের দেবতা সম্বন্ধে —মাঝিদের কল্পিত পাওনা-আদায়কারী নির্মম দেবতা আর 'মোক্ষদার মাতৃস্নেহে ব্যস্ত দেবতা'। যে কথাটা বাদ গেল তা হল—উপধর্মীয় নৃশংস কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নবভারতের অভিযান—যে অভিযানে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও অন্যতম কণ্ঠ।

বিক্রম দেখি 'মরণ-মিলন' কবিতাটি সম্বন্ধে রাদিচের ব্যাখ্যায় (পৃ ১৪০)। রাদিচের ধারণা, এই কবিতা যে সময়ে রচিত হয়, সেই সময়টায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে পরপর কয়েকটি মৃত্যুর ফলে (রাদিচে উল্লেখ করেছেন ১৯০২ সালে স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, ১৯০৩ সালে কন্যা রানী, ১৯০৪ সালে অনুরাগী সহকর্মী সতীশচন্দ্র রায়, ১৯০৫ সালে পিতা দেবেন্দ্রনাথ এবং ১৯০৭ সালে পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা) যে মৃত্যুভাবনা রবীন্দ্রনাথের চিত্ত অধিকার করেছিল, এই কবিতা তার থেকে প্রসূত। কিন্তু "সপ্তঋিতা"র শেষে যে গ্রন্থপরিচয় আছে তাতে দেখছি, এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০১ সালের বঙ্গদর্শনের ভাদ্র সংখ্যায় (১৯০২ খ্রীস্টাব্দের অগস্ট-সেপটেম্বরে), আর মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় ওই বৎসরই ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে (১৯০২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে)। এই কবিতা রচনাকালে রাদিচের উল্লেখিত মৃত্যুগুলির একটিও ঘটে নি। ব্যক্তিগত মৃত্যুশোক বা মৃত্যুভাবনা এ কবিতার উৎস নয়। জোর করে বলতে পারব না, কিন্তু মনে হয় সে সময়ে বাঙলাদেশে গৌরবময় মৃত্যুর জন্য একটা নিভৃত সাধনা চলছিল, তার সঙ্গে এই কবিতার একটা সংযোগ আছে। অগ্নিযুগের বিপ্লবী-মণ্ডলে আত্মবলিদানের আবেগ যে এই কবিতা থেকে উদ্দীপনা পেত, তার লিখিত প্রমাণ যদি কেউ চান, তিনি শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের "সেই মহাবরষার রাঙা জল" পুস্তিকাটি পড়ে দেখবেন।

ভূমিকায় এক জায়গায় রাদিচ বলেছেন, পাশ্চাত্ত্য ১৯৬০-এর দশকের প্রজন্মের কাছে, ১৯৮০-র দশকের তরুণতরুণীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ নিকটের লোক মনে হতে পারেন, তাঁর কণ্ঠ সম-অনুভূতির কণ্ঠ মনে হবে—তাঁর শিক্ষা-আদর্শ, জড়বাদ-বিরোধিতা, নারীর মর্যাদা ঘোষণা, আধ্যাত্মিকতার বিশিষ্ট ভঙ্গি—এসব রাদিচের সমবয়স্কদের কাছে পরিচিত মনে হবে (পৃ ৩৩)। অনুমান করি, রাদিচের সমবয়স্করা সকলেই এই কয়েকটি ব্যাপারেই মাত্র মগ্ন নন, এ যুগের কিছু-কিছু বহুজনীন সমস্যাও তাঁদের উদ্দীপ্ত করে। সংকলনটি উৎসর্গ করা হয়েছে শান্তি-আন্দোলনের প্রতি। অতএব, কবিতা নির্বাচন সম্বন্ধে আরো একটি কথা ওঠানো অসমীচীন হয় না। মনে হয়, "নবজাতক" গ্রন্থ থেকে 'কানাডার প্রতি' কবিতাটি, "প্রান্তিক" থেকে 'যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল' কবিতাটি একালের যেসব তরুণতরুণী শান্তি-আন্দোলনে বিশাল মিছিলে দীর্ঘ পথ হাঁটছে তাদের কাছে সমাদৃত হতে পারত।

অনুবাদের সমস্যা

কবিতার অনুবাদ যে শেষ পর্যন্ত অসফল হতে বাধ্য, ভাষান্তর করলে কবিতা আর কবিতা থাকে না, সেকথা সবাই জানে, রাদিচ ভালো করেই জানেন (পৃ ২৬)। তবু, অনেক কবিতার অনুবাদ বিশেষ প্রয়োজন। অন্যান্য ভাষা থেকে কিছু অনুবাদ—কিছু কবিতারও অনুবাদ—ছাড়া কোনো আধুনিক ভাষা সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে নি। অনুবাদ খঞ্জের নড়ির মতো হলেও, অনুবাদের সাহায্য ছাড়া কাব্যসংসারে সর্বত্র চলাফেরা অসম্ভব। অনুবাদ মূলবস্তুর অল্পশই হলেও একটা সন্ধান দেয়।

কবিতার অনুবাদ প্রয়োজন হলে তার বিচারেরও রীতিপদ্ধতি প্রয়োজন। এই ব্যাপারটা এখনো অনির্দিষ্ট, কারণ অনুবাদকরা সকলে এক রীতি অনুসরণ করেন না। কেউ চেষ্টা করেন ভাবানুবাদ করতে—গদ্যে, অথবা আড়ষ্ট পদ্যে; কেউ-বা ভাবানুবাদ করতে বসে মূলের অতিরিক্ত কিছু যোগ করে বসেন, যা প্রায়ই অনুবাদকের নিজস্ব ভাবোচ্ছ্বাস। এলিয়ট তো গিলবার্ট মারে-র ইউরিপিদিস থেকে অনুবাদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছিলেন এইজন্য।

মূল কবিতার ছন্দ ভাষান্তরে রক্ষা করা অসম্ভব। তবু, অনুবাদকরা কেউ-কেউ মূল ছন্দের সদৃশ কোনো ছন্দ ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন। সদৃশ ছন্দের প্রয়াস ছেড়ে দিয়ে কেউ-কেউ মূল কবিতার আকার ও গঠন অনুকরণ করার চেষ্টা করেন—পঙ্‌ক্তিসংখ্যা, পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস ও অন্ত্যমিল বা ওই ধরনের ব্যাপারগুলোর প্রতিরূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন ভাষায় সনেট-এর অনুবাদ বা অনুকরণ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, এবং বাঙলায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শেকসপীয়র-সনেট অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য বিদেশী ভাষা থেকে তাঁর অনূদিত কবিতাগুলিকে অনুবাদ না বলে 'প্রতিধ্বনি' বলেছিলেন। তাতে য়ুরোপীয় রেনেশাঁস-এর কালের 'ইমিটাটিও'-তত্ত্ব মনে পড়ায়। তৎকালীন 'আধুনিক' ভাষাগুলিতে (ইটালীয়ান, ফরাসি,) গ্রীক বা লাটিন কবিতার অনুবাদের চেয়ে অনুকৃতির প্রয়াস বেশি ফলপ্রদ মনে হয়েছিল। 'ইমিটাটিও' বা অনুকৃতি দুইপ্রকার হতে পারে—'সদৃশ প্রসঙ্গ, ভিন্ন প্রকরণ', অথবা 'ভিন্ন প্রসঙ্গ, সদৃশ প্রকরণ' ('সিমিলিস্ মাটেরিয়েই, ডিস্‌সিমিলিস ট্রাকটাটিও, ডিস্‌সিমিলিস্ মাটেরিয়েই, সিমিলিস্ ট্রাক্‌টাটিও')। সেইকাল থেকে একাল পর্যন্ত কবিরা অনেকেই কিছু না কিছু অনুকৃতি বা প্রতিধ্বনি করেছেন।

অনুকৃতি সম্বন্ধে "প্রতিধ্বনি" গ্রন্থের ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ অনেকগুলি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। কাব্যের 'রূপান্তর অসম্ভব', অনুকরণের চেষ্টাও 'আসলে অনর্থের বিড়ম্বনা', তথাপি বাঙলা ভাষাকে "ভাবনার নূতন প্রণালী শেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ; এবং তার ব্যঞ্জনা বাড়ানোর অন্যতম উপায় অনুবাদ", ইত্যাদি বলে তাঁর নিজের অনুবাদগুলি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "পরবর্তী পদ্য আমার লেখা হিসাবেই বিচার্য।" একথাটা বড়ো কথা যে অনুবাদই বলুন, অনুকৃতিই বলুন বা প্রতিধ্বনিই বলুন, বাঙলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদের বিষয়ে প্রথম বিচার্য ইংরেজি ভাষায় ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে কিনা—ইংরেজি কবিতা হিসাবে অনুবাদগুলির কোনো গুণ আছে কিনা।

এই বিচার করতে গেলে মূল বাঙলা কবিতাটা আপাতত ভুলে গিয়ে ইংরেজি কবিতাটাকেই মূল কবিতা ধরে নিয়ে একটু পড়তে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে আমার মতো বাঙালির পক্ষে ওই প্রয়াস প্রায় অসম্ভব; এবং খানিকটা বা অনধিকারচর্চা, কারণ আমি ইংরেজ নই। তাই মূলের সঙ্গে অনুবাদের কতটা নৈকট্য, সে বিচারই আমার পক্ষে প্রথম বিচার।

বাঙলায় দখল

বাঙলা ভাষায় রাদিচের দখল বেশ ভালো। নাহলে এই অনুবাদকর্মে তিনি প্রবৃত্ত হতেন না। যেখানে মূল বাঙলার অনেকটাই অনুবাদে হারিয়ে গেছে, সেরকম অনেক জায়গায় পাদটীকায় তিনি মূল বাঙলা (ইংরেজি হরফে) ও তার আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ কিছু-কিছু দিয়েছেন। তথাপি কয়েকটি জায়গায় তিনি বাঙলা কথাগুলোর ঠিক অর্থ ধরতে পেরেছেন বলে মনে হল না। অবশ্য বাঙালিরা, এমনকি বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপকরা, রবীন্দ্র-অধ্যাপকরা বা ইংরেজি সাহিত্যের বাঙালি অধ্যাপকরাও যে এসব জায়গায় সর্বদা নির্ভুল হবেন, তা হলফ করে বলতে পারব না। মনে পড়ছে যে "ঊষাদিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা" পঙ্‌ক্তিটির ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে 'দিশাহারা' শব্দটিকে ঊষার বিশেষণ ধরে নিয়ে স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন 'bewildered dawn'; ঊষাদিশা কিন্তু ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন, 'darkness without even a trace of dawn' কাছাকাছি অনুবাদ হত।

রাদিচের ভুলগুলি ওরকম নয়। কয়েকটি নমুনা দেখা যাক :

(১) 'বধূ' কবিতার অনুবাদে ৪৯ পঙ্‌ক্তিতে রাদিচে লিখেছেন—"I feel like a garland-seller,/my wares examined। মূলে আছে 'ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি'। বধূটি ফুলের মালা বিক্রি করতে আসে নি, মূলের অর্থ—বধূটি যেন একগাছি ফুলের মালা। পাদটীকায় কিন্তু রাদিচ ঠিকই লিখেছেন—"the Bride is made to feel that she is up for sale, like a garland" (পৃ ১২৯)।

(২) 'দুই বিঘা জমি'র প্রথম পঙ্‌ক্তির অনুবাদ হয়েছে 'I had sold off all my land except for one half acre'। মূলে ছিল "আর সবি গেছে ঋণে"। অনুবাদে 'ঋণ' লুপ্ত হওয়ায় দরিদ্র কৃষকের অবস্থার একটা দিক চাপা পড়ে গেছে।

(৩) ওই কবিতার ৩২শ পঙ্‌ক্তি, "I tremble in my soul and weep when I call you mother" ইংরেজিতে অদ্ভুত শোনায়, এবং বাঙলা "'মা' বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে" কথাগুলোর ঠিক অনুবাদও নয়।

(৪) 'মেঘদূত' কবিতার—

মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত-মাঝে পুঞ্জীভূত করে।

পঙ্‌ক্তি কয়টির ইংরেজি করা হয়েছে :

Your stanzas are themselves
Like dark-layered sonorous clouds,
heaping the misery
Of all separated lovers throught the world
Into thunderous music.

'শোক'-এর ইংরেজি misery না করাই ভালো, বিশেষত পাদটীকায় রাদিচ নিজেই যখন গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'ঘন' শব্দের একটা মানে মেঘ হলেও 'সঘন সংগীত' মানে পাদটীকার 'cloudy-music' অথবা অনুবাদের 'thunderous music' নয়, ওখানে ঘন শব্দের ইংরেজি 'dense' করলে ভালো হত। তাহলে 'পুঞ্জীভূত' শব্দটার আরেকটু গৌরব থাকত. 'heaped' ভালো লাগে না।

(৫) 'মরণ-মিলন' কবিতার ৪৪-৪৫ পঙ্‌ক্তিতে 'পিতা মনে মনে পরমাদ'-এর ইংরেজি করা হয়েছে "...in his mind/Her father agreed calamity had struck." অস্বস্তিকর ইংরেজি, কিন্তু দোষ বোধহয় বাঙলার নয়। 'মনে মনে' 'in his mind agreed' প্রায় হরফ ধরে-ধরে অনুবাদ। কী করলে ভালো হত বলতে পারি না, তবে "stood witless in apprehension" পিতার অবস্থাটার কাছাকাছি যায়।

(৬) ওই কবিতার ৫৭ পঙ্‌ক্তিতে "কোরো সব লাজ অপহরণ"-এর ইংরেজি হয়েছে "thrust my unreadi nessaside". 'লাজ'-এর ইংরেজি করার চেষ্টাই বোধহয় রাদিচ করেন নি।

(৭) 'আগমন' ('তখন রাত্রি আঁধার হল') কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-র অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ইংরেজি করার সময় রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দে ভাবানুবাদই করেছিলেন, মূলের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস বা আকৃতির কোনো প্রতিবিম্ব রাখেন নি। রাদিচে তাঁর অনুবাদে মূলের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস ও স্তবকের অনুকৃতি করার চেষ্টা করেছেন, অন্ত্যমিলের কিছু আভাস এবং প্রত্যেক স্তবকে একটি করে বিশেষ শব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি রেখেছেন। এ প্রয়াস প্রশংসনীয়। কিন্তু এই প্রয়াসের তাগিদে তিনি "হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা' পঙ্‌ক্তিটির অনুবাদ করেছেন—'Alas what shame, what destiny,/No court, no robes, no finery—"। মূলের চারটি শব্দের জায়গায় অনুবাদে পাঁচটি শব্দ এসেছে, মূলের 'সজ্জা' ডেকে এনেছে 'robes' এবং 'finery'। আর অন্ত্যমিলের আভাস দেওয়ার জন্যই হোক, অথবা 'ভাগ্য' শব্দটির ইংরেজি করার তাড়নায়ই হোক, এসেছে 'destiny' শব্দটি। "হায়রে ভাগ্য" ইংরেজিতে 'what destiny' হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে 'হায়রে ভাগ্য' রাখেন নি। "Oh shame, Oh, utter shame" বলেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন।৩ 'Alas'-ই যথেষ্ট, তার পরেও 'what destiny' কানে লাগে।

(৮) 'বীথিকা' গ্রন্থের 'উদাসীন' কবিতাটির "Unyielding" শীর্ষক অনুবাদে মূলের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস, স্তবকবিন্যাস এবং মিলের আভাস রাখার চেষ্টায় 'পূর্ণতা' শব্দের ইংরেজি করা হয়েছে 'perfectness'। মূল কবিতায় 'পূর্ণতা' কিন্তু completeness এবং consummation-এর ব্যঞ্জনা বহন করে।

(৯) 'পৃথিবী' কবিতার ১৬শ (মূলের ১৫শ) পঙ্‌ক্তি "সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা" ইংরেজিতে হয়েছে "Life proclaims its triumph in the face of dcath"। বাঙলা বাক্যটির অবশ্য দু'রকম অর্থ হয়, এবং রাদিচ হয়তো ঠিকই অনুবাদ করেছেন। 'মুখ' শব্দের ইংরেজি face হতে পারে, কিন্তু 'mouth'-ও হতে পারে। 'মৃত্যুই প্রাণের জয়বার্তা ঘোষণা করে' এই অর্থের সম্ভাবনা বর্জন করা যায় না।

(১০) এই কবিতায় ৩য় পঙ্‌ক্তির "বীরভোগ্যা" শব্দের ইংরেজি করা হয়েছে "knowable only by the mighty"। মেনে নিতে পারছি না, অন্য কী হতে পারত, তাও এখনি বলতে পারছি না। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তারকনাথ সেন পুরো পঙ্‌ক্তিটির অনুবাদ করেছিলেন—"Valiant are you, meant for heroes only"—মূলের অনেকটা কাছাকাছি।

(১১) এই কবিতারই 'দানব' এবং 'দেবতা'র ইংরেজি অনুবাদে যেসব জটিল সমস্যা রাদিচে পাদটীকায় তা বিবৃত করেছেন। একবচন 'দানব' ও 'দেবতা'-কে রাদিচে বহুবচনে demons, gods করেছেন—তাতে ইংরেজ পাঠকের একধরনের বিভ্রান্তি হয়তো এড়ানো যায়, কিন্তু কবিতাটির ব্যঞ্জনা ক্ষুণ্ন হয়। তারকবাবু 'দানব'-কে একবচনে The demon করেছিলেন, কিন্তু 'দেবতা'-র বেলায় তিনিও বহুবচন গডস ব্যবহার করেছিলেন। 'দানব' এবং 'দেবতা' অনুবাদ না করে ইংরেজি ভাষায় নিয়ে নিলে ভালো হত মনে হয়।

এরকম আরো দুটি নির্দেশ করা যায়, বা নেহাত মতান্তর উল্লেখ করা যায়। এর চেয়ে বড়ো ত্রুটি যে দেখাতে পারছি না, সেটা রাদিচের প্রচেষ্টার খানিকটা সাফল্যের প্রমাণ নিশ্চয়ই।

ইংরেজির বিচার

আমি ইংরেজ নই, নিতান্ত বাঙালি, ইংরেজের লেখা ইংরেজির বিচার আমার সাজে না। তবে অনেক দিন ধরে ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, পড়াই, শুনি এবং কখনো কখনো বলি—তাতে কানের কিছু অভ্যাস হয়েছে। সে অভ্যাসও হয়তো পুরনো, যেসব ব্যাপারকে ইংরেজি ভাষার স্বভাব-বহির্ভূত বলে আমার মনে হয়, হাল আমলের ইংরেজিতে সেসব হয়তো স্বাভাবিক। এইসব দ্বিধাসংকোচ সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে, নীচে উল্লেখিত প্রয়োগগুলি আমার বিবেচনায় অস্বস্তিকর। রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজি অনুবাদের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে রাদিচে তাঁর ভূমিকায় (পৃ ৩১) 'My darling', 'the speech of the learned', 'Alas for me' কথাগুলোকে যে-কোনো ইংরেজ পাঠকের পক্ষে অস্বস্তিকর বলেছেন। আমি যে দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করছি সেগুলি আমার কানে লাগছে। রাদিচে চেয়েছেন যে তাঁর অনুবাদগুলি উচ্চারিতভাবে পড়া হোক ('They are meant to be read aloud'—ভূমিকা পৃ ৩৬)। নীচের দৃষ্টান্তগুলির অন্তত কয়েকটি শ্রুতিকটু বলেও আমার মনে হয়েছে। কয়েকটি ইতিপূর্বে বাঙলা শব্দের অনুবাদের সাফল্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

(১) 'In her final moments Binu had taken the dust of my feet.../.../These last two months will be marked on my brow forever—/ Like the everlasting vermillion in the parting of Lakshmi's hair. (পৃ ৮৫)

—'taken the dust of my feet', 'marked on my brow forever', 'everlasting vermillion in a parting of hair'—

মূলানুগ হলেও বাঙালি গৃহবধূকে বেখাপ্পা ইংরেজি কাপড় পরানোর চেষ্টা, তা-ও কাপড় পরার ধরনটা ইংরেজি নয়।

(২) "সেই দু'মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি/ পঁচিশ টাকার ফাঁকি" কথাগুলোর ইংরেজি হয়েছে "I am guilty of a dreadful omission from that two-month offering—/A debt of twenty-five rupees" (পৃ ৮৫)। এটি বেশ আপত্তিকর। প্রথমত ইংরেজি 'dreadful omission' ভারি শব্দ হলেও হালকাচালের লঘু কথাবার্তার অভ্যাসগত ব্যবহার—"বিষম বাকি" শব্দের বেদনা ওতে নেই। দ্বিতীয়ত, "guilty of a dreadful omission from that two-month offering" কোনোরকমেই ইংরেজি শোনায় না। তৃতীয়ত, 'A debt of twenty-five rupees' যেভাবে এসেছে তাতে গোটা ব্যাপারটা হাস্যকর শোনাচ্ছে। "ফাঁকি' 'debt' নয়।

(৩) 'As we cut the paddy it started to rain' (পৃ ৫৩); "কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা" বলতে যা বোঝায় ইংরেজি বাক্যটিতে ঠিক তা বোঝায় না। কিন্তু ইংরেজি বাক্য হিসেবেও ভালো শোনাচ্ছে না।

(৪) 'You showed no responsiveness' (পৃ৯৯) —অন্ত্যমিলের দাবি মেটানো হয়েছে, কিন্তু কৃত্রিম। আমাদের ছাত্রদা পরীক্ষার খাতায় এরকম লিখলে আমরা হয়তো কটূহাস্যসহকারে কেটে দিই, হয়তো তাদের প্রতি অন্যায় করি। কিন্তু ইংরেজিতে কি ভালো শোনাচ্ছে?

(৫) "বাতাস আলো গেল মরে, এ কী রে দুর্দৈব" ইংরেজিতে হয়েছে "The tragedy of it cuts off

air and blocks out light"। "দুর্দৈব" আর "tragedy" সমার্থক নয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি আপত্তি ইংরেজি বাক্যটি নিয়ে,—the tragedy of it cuts off শ্রুতিকটু শুধু নয়, ইংরেজি ভাষার স্বভাব-বিরুদ্ধে বলে মনে হচ্ছে।

এরকম আরো কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু সংখ্যা খুব বেশি হবে না বলে আপাতত মনে হচ্ছে। তাহলে, দোষ ধরার চেষ্টা করেও বেশি দোষ ধরতে পারছি না বলে, মোটামুটি প্রশংসাই রাদিচের প্রাপ্য।

আরো একটু প্রশংসা

আরো প্রশংসা রাদিচের প্রাপ্য। যখন ভাবি ইংরেজি কবিতার বাঙলা অনুবাদে আমাদের কৃতিত্বের পরিমাণ কতটুকু ; যখন ভাবি শেকসপীয়রের অনুবাদে আমরা কতখানি সাফল্য দেখাতে পেরেছি ; যখন ভাবি, কবিতা দূরে থাক, লক্ বা হিউম-এর স্বচ্ছ গদ্য আজও আমরা অনুবাদ করে উঠতে পারি নি ; তখন রবীন্দ্রনাথের এই নবীন বিদেশী বন্ধুর আন্তরিকতা, যত্ন, পরিশ্রম বিস্ময়-কর বলেই মনে হয়।

তা ছাড়া, কয়েকটি কবিতার রাদিচে-কৃত 'প্রতিধ্বনি' রীতিমতো সফল। 'ঠাকুরদাদার ছুটি', 'তালগাছ' ভালো হয়েছে, অনুবাদ যথাযথ কিনা বিচার করার ইচ্ছাই হয় না। 'তপোভঙ্গ' ইংরেজিতে অনুবাদ করার চেষ্টাই অসম্ভব মনে হত, রাদিচে সেই চেষ্টা করেছেন, তার কোথায় কতটুকু ত্রুটি হয়েছে তার হিসেব করা ইতর অরসিকতা।

Rabindranath Tagore : *Selected Poems*; Translated by William Radice. Penguin Books 1985. Pp. 202 £2.95 (U.K.)

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

চার

বদিউজ্জামান মাঝে-মাঝে মসজিদেই রাত্রিযাপন করতেন। সেইসব সময় তাঁকে দূরের মানুষ বলে মনে হত। এমনিতেই তাঁর চেহারায় সৌন্দর্য আর ব্যক্তিত্বের ঝল-মলানি ছিল। কিন্তু গাম্ভীর্য তাঁকে দিত এক অপার্থিব ব্যঞ্জনা। লোকেরা ভাবত, এ মানুষ এই ধুলোমাটির পৃথিবীর নয়। আর শফিও দূর থেকে মুগ্ধ চোখে তার পিতাকে লক্ষ করত। বদিউজ্জামান মৌলাহাটের প্রথম রাত্রিটি মসজিদে কাটানোর পর মায়ের হুকুমে সকালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিল শফি। কিন্তু তিনি তাকে দেখেও যেন দেখলেন না। শিষ্যপরিবৃত মৌলানা মৃদু-গম্ভীর স্বরে তাদের সঙ্গে কী আলোচনা করছিলেন। শফি একটু দাঁড়িয়ে থেকে মনমরা হয়ে চলে এসেছিল।

ওমরের বাড়িতে যখন শফিদের ঘরকন্না পাতা হল, তখনও বদিউজ্জামান মসজিদবাসী। সেখানেই আহার নিদ্রা, সেখানেই বাস। তবে ঘরকন্না গুছিয়ে তুলতে সাইদা পটু ছিলেন। দরিয়াবানুও ছিলেন তাঁর পাশে। কয়েকটি দিনেই গ্রামের প্রান্তে পোড়ো বাড়িটির চেহারা ফিরে গেল। বাড়ির খিড়কিতে ছিল একটি হাসচরা পুকুর। তার তিনপাড়ে বাঁশের বন। বাঁশের বনের শীর্ষে দেখা যেত খোঁড়া পিরের মাজারের প্রকান্ড বটগাছটির মাথা। এক দুপুরে চুপিচুপি রুকু ও রোজির প্ররোচনায় শফি সেই মাজারে গিয়েছিল।

রোজি তখন সেই তর্কটা তুলেছিল। কী শফি? থান থেকে ওই আধপয়সাটা তুলতে পারবে তো?

উঁচু ইঁটের জীর্ণ মাজার। আগাছা আর ঘাসে ঢাকা। তার নিচে একটা কালো পাথরের ওপর সেদিন মোটে একটা তামার আধপয়সা পড়ে ছিল। শফি হাত বাড়াতে গেলে রুকু ভয় পেয়ে তার হাত চেপে ধরেছিল। রুকুর মুখে অদ্ভুত একটা যন্ত্রণার ছাপ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল শফি। তারপরই রোজির ভ্রূকুঞ্চিত চাহনির সামনে রুকু অপ্রস্তুত হয়েছিল শফির হাত ধরেছে বলে। হাত ছেড়ে দিয়েছিল সে।

মেয়েদের হাতের ছোঁয়া শফিকেও চমকে দিয়েছিল। বিশেষ করে রুকুর হাতের ছোঁয়া! তার মনে হয়েছিল, আরও কিছুক্ষণ হাতটা ধরে থাকল না কেন রুকু? সেই লোভেই সে আবার হাত বাড়াতে গিয়েছিল। কিন্তু তখন

রোজি বোনকে একপাশে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেছে। রোজির নাসারন্ধ্র স্ফীত। শফির এই সাহস দেখে সে মনে-মনে ক্ষুব্ধ। যদিও তর্কটা সেই তুলেছে।

শফি বুঝতে পেরেছিল, সে তামার আধপয়সাটায় সত্যি-সত্যি হাত দিক, রোজি এটা চায় না। কিন্তু যে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে, তাকে একটা চরম পরিণতি দেওয়ার জন্য জেদ তাকে পেয়ে বসলেও সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে বাধা এল।

মাজারের অন্যদিক থেকে বেরিয়ে এল একটি যুবতী। তার হাতে একটা কাটারি। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দুই বোনই তাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়েছিল। তারা হাসবার চেষ্টা করছিল। মেয়েটি ভুরু কুঁচকে শফিকে দেখে বলল, এ বুঝি তোমাদের পিরসায়েবের ছেলে?

রোজি-রুকু মাথাটা নেড়েই শফিকে অবাক করে দৌড়ে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেল। শফি ক্ষুব্ধভাবে তাদের দেখছিল। মেয়েটি বলল, কী ভাই? নাম কী তোমার?

শফি মৃদুস্বরে বলল, শফিউজ্জামান।

বড্ড খটোমটো নাম। মেয়েটি হাসতে লাগল। এখানে কী করছিলে তোমরা?

শফি বলল, পিরের থানের পয়সা নিলে নাকি হাত পুড়ে যায়, তাই দেখতে এসেছিলাম।

মেয়েটি দ্রুত চোখ ফেরাল সেই কালো পাথরটার দিকে। তারপর পয়সাটা দেখামাত্র ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আঁচলের খুঁটে বেঁধে ফেলল। তার মুখে দুষ্টুমির হাসি। চাপা গলায় বলল, কাউকে বোলো না যেন পির-সায়েবের ছেলে। কিরে দিলাম।

এই মেয়েটি যে কুষ্ঠরোগী আবদুলের বউ, সেটা পরে জেনেছিল শফি। আবদুলের বউ-এর নাম ইকরা। কেউ-কেউ তাকে ইকরাতন বলেও ডাকত। যেদিন মজলিশে তার বিচারের জন্য ডাক পড়েছিল, সেদিন শফি শুনে-ছিল, তাকে ইকরাতন বিবি বলে ডাকা হচ্ছে। তবে সে কথা অনেক পরের। সেদিন খোঁড়াপিরের মাজারে ইকরাকে খুব ভালো লেগেছিল শফির। ফিরে গিয়ে রোজি-রুকুর কাছে তার থান থেকে পয়সা নেওয়ার ঘটনাটা জোর দিয়ে বর্ণনা করেছিল। ইকরার হাত তো পুড়ে যায় নি।

রোজি বলেছিল, ইকরা যে ডাইনি। আয়মনিখালার কাছে শুনেছে। ইকরা রাতদুপুরে গাছ চালিয়ে নিয়ে কোন্ দেশে চলে যায়। আবার ফিরে আসে ভোরবেলা আজানের আগে।

কোন্ গাছটা চালিয়ে নিয়ে যায়, সেটাও দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েছিল রোজি। ইকরাদের বাড়ির পেছনে ঘরের চাল ঘেঁষে একটা লম্বাটে শ্যাওড়াগাছ আছে। নিশুতি রাতে ইকরা উলঙ্গ হয়ে চুল এলিয়ে সেই গাছটাতে চড়ে বসে। মন্তর পড়ে। আর গাছটা মূলছাড়া হয়ে আসমানে উঠে যায়। তারপর শূন্যে ভাসতে-ভাসতে চলে কোন্ অজানা দেশে।

শফি প্রথম-প্রথম হেসে উড়িয়ে দিত। পরে তার আবছা মনে হত, হয়তো ব্যাপারটা সত্যি। জিন যখন আছে, তখন ডাইনিও থাকতে পারে। এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করত সে। ইকরার দিকে তার মন পড়ে থাকত।

খিড়কির ঘাটের মাথায় বসে দুই বোন শফিকে ডাইনির গল্প শোনাত। ঘাটে সাইদা আপনমনে কাপড় কাচতেন। পুকুরটা গ্রামের শেষে বলে একেবারে খাঁ-খাঁ। পুরুষেরা পিরপরিবারের খাতিরে পুকুরের কাছাকাছি কেউ পারতপক্ষে আসত না। বাঁশকাটার দরকার হলে আগাম জানিয়ে রাখত। দৈবাৎ কেউ এসে পড়লে জোরে কেশে বা গলা ঝেড়ে সাড়া দিত। আর ঘাটের আসরে কোনো-কোনোদিন এসে যোগ দিত আয়মনিও। তখন আয়মনিই কথক। এরা তিনজন শ্রোতা। কাপড় কাচতে-কাচতে মুখ ঘুরিয়ে সাইদা বলতেন, অ শফি! তুই এখনও বসে আছিস? তোকে বললাম না কাজেমের দোকানে বলে আয়?

শফি বলত, যাচ্ছি।

কিন্তু তখন আয়মনি চাপা স্বরে আগের রাতে মসজিদের মাথায় আলোর ছটা দেখার গল্প শুরু করেছে। মসজিদে বদুপিরের রাত্রিযাপনের পর গ্রামে এই ঘটনাটা রটে গিয়েছিল। রাত্রে নাকি জিনেরা আসে তাঁর সঙ্গে ধর্মালোচনা করতে। জিনেদের শরীরের সেই ছটা স্বচক্ষে দেখার মতো লোকের অভাব ঘটছিল না। ক্রমশ বদিউজ্জামানের বুজুর্গ সাধকখ্যাতি আরও মজবুত হয়ে উঠছিল জনমনে। হাটবারে লোকের মুখেমুখে এইসব কথা দূরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল দিনেদিনে।

ইকরা বাঁশবনে বা খোঁড়াপিরের মাজারে কেন ঘুরে বেড়ায়, তার একটা ব্যাখ্যা ছিল। সে আসলে জড়িবুটি

সংগ্রহ করে ওই জঙ্গল থেকে। সে ভিনগাঁয়ে গিয়ে বউঝিদের কাছে ওইসব আজব জিনিস বেচে আসে। তার বদলে চালডাল হাঁসমুর্গি ডিম পায়। কখনও পায় আনাজপাতি, একটা কুমড়ো বা দুটো বেগুন। তার কুঠো স্বামী আবদুল সারাদিন দাওয়ায় পড়ে থাকে আর খোনাস্বরে আপনমনে গান গায়।

একদিন শফি খোঁড়াপিরের মাজারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রোজি-রুকুর প্রতি শাসন বেড়েছে বলে তারা আগের মতো হুট করে যেখানে-সেখানে বেরতে পারে না। শফি আসলে ডাইনি মেয়েটাকেই দেখতে গিয়েছিল।

কিন্তু কতক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও তাকে দেখতে পায় নি সে। আনমনে হাঁটতে-হাঁটতে বাঁশবনের শেষ দিকটায় চলে গিয়েছিল। সেই সময় কেয়াঝোপের আড়ালে একটা কুঁড়েঘর চোখে পড়েছিল তার।

ঘরটার অবস্থা জরাজীর্ণ। চাল ঝাঁঝরা। খড়ের ফাঁকে কোঙাপাতা গোঁজা। উঠোন ঘিরে পাঁচিল নেই। ঘন শেয়াকুলকাঁটার বেড়া। শফির কানে এল, খোনাস্বরে কেউ গোঁ-গোঁ করে গান গাইছে। তার বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। সে ঝটপট একটা দোওয়াও আওড়ে ফেলল মনে-মনে। তারপর সাহস করে উঁকি মেরে দেখল দাওয়ায় নোংরা বিছানায় একটা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক চিত হয়ে শুয়ে আছে। তার চেহারাটি বীভৎস। হাত-পা কুঁকড়ে রয়েছে। ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে সে গান গাইছে দেখে শফি অবাক। এই তাহলে ইকরার স্বামী আবদুল।

একটু পরে আবদুল তাকে দেখতে পেয়ে গান থামাল। সেও কয়েক মুহূর্ত ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল শফির দিকে। তারপর ভুতুড়ে গলায় বলে উঠল, কে বাপ তুমি?

শফি বলল, আমি পিরসায়েবের ছেলে।

আবদুল নড়বড় করে উঠে দেয়ালে হেলান দিল। তার কুৎসিত মুখে হাসি। সালাম বাপ, সালাম! আসেন, মেহেরবানি করে ভেতরে আসেন। আপনাকে একটুকুন দেখি।

বেড়াটা সরিয়ে শফি উঠোনে গেল। ছোট্ট পেয়ারা-গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলল, তুমি আবদুল?

জি বাপ। আমিই সে। আবদুল তাকে দেখে প্রশংসা করতে থাকল। আহা হা! শুনেছিলাম বটে পিরসায়েবের বেটার কথা। কী নাক, কী মুখ, কী ছুরত বাপের আমার! দেখে মনে হয় কী, এ দুনিয়ার কেউ লয়কো। ও বাপ, আপনাকে দেখেই আমার শরীলের যন্তনা ঘুচে গেল গো!

সে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। শফি বলল, তুমি কাঁদছ কেন আবদুল?

আবদুল বলল, মোনের সুখে বাপজি গো! কেউ তো আমাকে দেখতে আসে না। তাতে আপনি হলেন পিরসায়েবের বেটা! ও বাপ! আজ আবদুলের ঘরে আসমানের তারা ছিটকে এসেছে দিনদুপুরে। হায় হায়! এ মানুষকে আমি কোথা ঠাঁই দিই?

আবদুল বদুপিরের দোয়া চেয়ে ব্যর্থ। পিরসাহেব বলেছেন, আগে তার আউরতকে বোত-পরস্তি (পৌত্ত-লিকতা) ছাড়তে হবে। পর্দানসীন হতে হবে। তাঁর কাছে তওবা করতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়তে হবে। তবেই তার মরদের ওপর তাঁর করুণা হবে। আবদুল সেইসব কথা বলতে থাকল দুঃখের সঙ্গে। শোনার পর শফি খুব গম্ভীর হয়ে বলল, আব্বাকে সে বলবে। অথচ শফি জানে, সে-ক্ষমতা তার আদতে নেই। তার মায়েরও নেই। আব্বার সঙ্গে কথাবার্তা বলাই তার পক্ষে একটা অসম্ভব ঘটনা। বদিউজ্জামানের সঙ্গে তার সে-সম্পর্ক এখনও স্থাপিত হয় নি। বড়ভাই নুরুজ্জা-মানের কথা অবশ্য আলাদা।

কিছুক্ষণ পরে শফি আবদুলের একটা কথা শুনে চমকে উঠেছিল। আবদুল নিজের হাতদুটো দেখতে-দেখতে বারবার বলছিল, বড়ো গোনা করেছিলাম এই হাতে। তারই ফল, বাপ!

কী গোনা, আবদুল? শফি জানতে চেয়েছিল।

জবাব আবদুল তাকে দেয় নি। শফি আর পীড়া-পীড়ি করে নি। সে সারাক্ষণ শুধু ডাইনি মেয়েটাকে খুঁজছিল এদিক-ওদিক তাকিয়ে। কিন্তু মুখে জিগ্যেস করতে বাধছিল। একসময় সে আবদুলের একঘেয়ে বিরক্তিকর কাঁদুনি আর ভুতুড়ে কণ্ঠস্বরে অতিষ্ঠ হয়ে চলে এসেছিল।

এর কয়েকদিন পরে শফি রোজিদের বাড়ি গেছে, দলিজঘরের বারান্দায় একটা লোককে দেখতে পেল। লোকটি আরামকেদারায় বসে খয়রাডাঙার জমিদার-সাহেবের মতো বই পড়ছিল। তার চেহারা দেখে শফির সন্দেহ হয়েছিল লোকটি কি হিন্দু? মুখে দাড়ি ছিল

না। পরনে ধোপদুরস্ত পোশাক। পাশে একটা ছাঁড়ও দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা। তার দিকে একবার তাকিয়েই লোকটি আবার বইয়ের পাতায় চোখ রাখল।

রোজিদের বাড়িতে শফির গতিবিধি ছিল অবাধ। সে আড়চোখে লোকটিকে দেখতে-দেখতে সদরদরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বারান্দায় দু-বোন দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। শফিকে দেখতে পেয়ে তারা পরস্পর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে চোখ টেপাটিপি করল। তারপর রোজি একটু হেসে চাপা গলায় বলল, শফি, দলিজে কাউকে দেখতে পেলে না?

শফি মাথা নাড়ল। তখন রুকু বলল, বারুচাচাজি এসেছে। জানো? খুব শিক্ষিত লোক। ইংরেজি পাস। নবাববাহাদুরের কাছারির দেওয়ানসাহেব।

রোজি বলল, তোমার কথা বলেছি চাচাজিকে। রুকু, খবর দিয়ে আয় না রে শফি এসেছে।

রুকু চলে গেল খবর দিতে। দরিয়াবানু অন্যঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা রোগাটে চেহারার লোককে তম্বি করছিলেন। শফির দিকে ঘুরে বললেন, কী গো ছেলে! আজকাল আসাই যে ছেড়ে দিয়েছ! বিবিজি বলছিলেন, খালি টো-টো করে কোথা-কোথা ঘুরে বেড়াচ্ছ। পিরসাহেব ঘরসংসারে মন দিচ্ছেন না বলে তুমি পর মেলে দিয়েছ!

দরিয়াবানু হাসতে লাগলেন। রোগাটে লোকটি এই সুযোগে তার কোনো কথাটা আবার তোলার চেষ্টা করল। অমনি দরিয়াবানু চোখ কটমটিয়ে বললেন, বেরো মুখপোড়া বাড়ি থেকে। দুবিঘে মাটিতে দুবিঘা ধান ফলাতে পারিস না। আবার বড়ো-বড়ো কথা! এবার ও জমি চষবে কাজিডাঙার মধু। তাকে কথা দিয়েছি।

সেই বয়সে সবকিছুতে শফির কৌতূহল ছিল তীব্র। কিন্তু ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার আগেই চাঁটর শব্দ তুলে বাইরে থেকে রোজি-রুকুর সেই বারুচাচাজি এসে বললেন, কই গো? কোথায় তোমাদের পিরসাহেবের ছেলে?

দুই বোন ইশারায় শফিকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব দিতে হবে। কিন্তু শফির পিতার শিক্ষা, আল্লাহ ছাড়া কারুর উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকানো বারণ। সে আস্তে বলল, আসসালাম আলাইকুম!

বারুমিয়া হো হো করে হেসে উঠলেন।...একেবারে খুদে মৌলানা যে গো? কী নাম তোমার?

রুকু বলে দিল, বদিউজ্জামান।

রোজি বলল, আমরা শফি বলি।

বারুমিয়া বললেন, এসো এসো। তোমার সঙ্গে গল্প করি। বারান্দায় এসো।

শফি সংকোচ করছে দেখে নিচে নেমে এলেন বারুমিয়া। হাসতে-হাসতে বললেন, আমার নাম চৌধুরি আবদুল বারি। খুব নাচোড়বান্দা লোক, বাবাজীবন! এসো, তোমার সঙ্গে বাতচিত করে দেখি তুমি কতটা লায়েক হয়েছ।

দরিয়াবানু ঘোমটা টেনেছিলেন মাথায়। জিভ কেটে বললেন, হল তো? এবার পিরসাহেবের ছেলের মাথায় বোত-পরস্তি ঢুকিয়ে দেবেন ভাইজান।

বারুমিয়া বললেন, তোমরা আমাকে কী ভাবো বলো তো দরিয়া খাতুন? ওগো ছেলে, মেয়েদের কথায় কান দিয়ো না। এসো।

বারুমিয়ার বগলে ছড়ি, হাতে কী একটা বই। দলিজঘরের ভেতর দিয়ে শফিকে বাইরে নিয়ে গেলেন। বাইরের বারান্দায় একটা তক্তাপোশ ছিল। শফিকে টেনে সেখানে বসিয়ে নিজে পাশে বসলেন। তারপর বললেন, তারপর শফিউজ্জামান! লেখাপড়া কদ্দুর হল?

শফি মৃদুস্বরে বলল, ফোর্থ ক্লাসে পড়ছিলাম।

কোন স্কুলে?

খয়রাডাঙায়।

হুঁ। তারপর এখানে এসে সময় নষ্ট করছ? আব্বাসাহেবকে বলো নি পড়ার কথা?

শফি চুপ করে রইল। তার ভবিষ্যৎ তার পিতার হাতে এটাই সে জেনে এসেছে এতদিন।

বারুমিয়া বললেন, পিরমৌলানারা বুজুর্গ সাধকপুরুষ। তাঁদের লাইন আলাদা। অথচ তোমাকে ইংরেজি পড়তে দিয়েছিলেন। দিয়েও খেয়াল নেই যে বছর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেন গো? মাত্র দুক্রোশ দূরে হরিণমারায় হাইস্কুল আছে। রোজ যাতায়াত না করতে পার, ওখানে কারুর বাড়ি থাকার ব্যবস্থা করা শক্ত না। আজই পিরসাহেবের কাছে কথাটা তুলব।

বলেই ফিক করে হাসলেন বারুমিয়া।...তবে খোলাখুলি বলছি বাপু, আমার ওসব পিরবুজুর্গে বিশ্বাস নেই। তুমি নাস্তিক মানে বোঝো?

শফি তাকাল।

নাস্তিক মানে যার আল্লাখোদায় বিশ্বাস নেই। আমি তোমাদের ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না। আল্লাখোদা বলে কোথাও কিছু নেই। মানুষ হল নেচারের সৃষ্টি। নেচার বোঝো তো?

শফি এমন উদ্ভট কথা কখনও শোনে নি। সে বিব্রতভাবে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছিল। দরজায় দুই বোন উঁকি দিচ্ছিল। তাদের মুখ যেন শাদা হয়ে গেছে। জেনেশুনে শফিকে বারুচাচাজির কাছে ঠেলে দিয়ে তারা বড়ো অপরাধী যেন।

বারুমিয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো ছেলে! দুজনে একচক্কর নদী অব্দি ঘুরে আসি। তোমার মুখে বাপু কী যেন জাদু মাখানো আছে। দেখে বড়ো আপন মনে হয়।

শফি হয়তো তর্ক করবার জন্যই সেদিন বারুমিয়ার বৈকালিক ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিল। অথচ লোকটিকে তার হঠাৎ খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। অনেক পরে শফির মনে হত, পৃথিবীতে কোনো-কোনো লোক আছে —তাকে কেন যেন ভীষণ চেনা মনে হয়। মনে হয় তার সবকিছুই লোকটির জানা। অসহায়ভাবে ধরা পড়ে যেতে হয় তার কাছে। অথবা আত্মসমর্পণ করতে হয় অগাধ বিশ্বাসে।

বাদশাহি সড়কে যেতে-যেতে বারুমিয়া অনর্গল তাকে যাসব বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন, তা শফি তার স্কুলের বইতে পড়েছে। পড়তে হয় বলেই পড়েছে। কিন্তু মন দিয়ে গ্রহণ করে নি। সে তিনমাস ঋতুর চক্র, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, নক্ষত্রমণ্ডলীকে জানে আল্লার রাজ্যের হুকুমদারিতে গাঁথা। এক ফেরেশতা সূর্যকে টানতে-টানতে পৃথিবীর আকাশ পার করে নিয়ে যায়। আরেক ফেরেশতা চাঁদকে এমনি করে টেনে নিয়ে চলেন। সে জানে, মৃত্যুর সময় সাংঘাতিক ফেরেশতা আজরাইল এসে মানুষের প্রাণ 'কবজা' করেন। অথচ বারুমিয়া বলছিলেন এমন সব কথা, যা এসবের একেবারে উলটো।

পিরের সাঁকোর কাছে গিয়ে বারুমিয়া হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, তোমার আব্বাকে এসব আবার বোলো না। পিরমৌলানারা এ বারু চৌধুরিকে দেখলেই শয়তান-খেদানো দোওয়া পড়েন। তা শোনো গো ছেলে, পড়তে চাও হরিণমারা হাইস্কুলে?

শফি বলেছিল, হুঁউ।

ঠিক আছে। আমিই কথা তুলব পিরসাহেবের কাছে।

বারুমিয়া নদীর চড়ায় হাঁটতে-হাঁটতে কিছুদূর গিয়ে বলেছিলেন, ওই দেখো সূর্যাস্ত হচ্ছে! বড়ো সুন্দর, তাই না?

সূর্যাস্তের ব্যাপারটা সেই প্রথম সচেতনভাবে লক্ষ করেছিল শফি। তার মনে হয়েছিল, সত্যি তো! এমন একটা ব্যাপার রোজই ঘটছে, অথচ কেন তার চোখ পড়ে নি? নদীর মাঝখানে একটা ঢিপি ছিল। ঢিপিটা ঘাসে ভরতি। সেখানে দুজনে উঠে গিয়েছিল। তারপর বারুমিয়া তার হাত ধরে টেনে বলেছিলেন, এখন আর কথা নয়। চুপচাপ বসো। নাকি তুমি মগরেবের নমাজ পড়তে চাও?

বারুমিয়ার মুখে বাঁকা হাসি লক্ষ করেছিল শফি। কিন্তু আজ কে জানে কেন তার নমাজ পড়তে ইচ্ছে করছিল না। সে একটা আশ্চর্য অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বিশাল মাঠের ওপর সূর্যাস্তের হালকা আলো নরম কুয়াশার মধ্যে মুছে যাচ্ছিল ক্রমশ। নদীর বুক বালির চড়ায় ভরা। একপাশে ঝিরঝিরে জলের একটা ফালি। বালির ওপর পাখিরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। জনহীন মাঠের মাঝখানে সেই সময়টা তাকে পেয়ে বসছিল। তার মাথায় কোনো কথা আসছিল না। মগরেবের নমাজ পড়লে এই আচ্ছন্নতাটা সে কাটিয়ে উঠতে পারত হয়তো। অথচ সে-মুহূর্তে তার বারুমিয়া হয়ে যেতেই ইচ্ছা। সূর্য যখন দিগন্তরেখা থেকে একেবারে মুছে গেল, তখন সে একটা চাপা শ্বাস ফেলেছিল।

বারুমিয়া বলেছিলেন, কী গো? কথা বলছ না কেন?

শফি মৃদু হেসে বলেছিল, আপনিই তো কথা বলতে বারণ করলেন।

আচ্ছা! তার পিঠে সস্নেহে থাপ্পড় মেরেছিলেন বারুমিয়া।...নেচারের কথা বলছিলাম তোমাকে। নেচার হল বাংলায় প্রকৃতি। এই প্রকৃতি জিনিসটা কী, এসব জায়গায় এসে বোঝা যায়। আমি নবাববাহাদুরের দেওয়ানি করি। হাতির পিঠে চেপে কাঁহা-কাঁহা মুলুকে আমাকে ঘুরতে হয়। তো—

হাতির পিঠে?

হাঁ। হাতির পিঠে। তো আগে কথাটা বলি। তো একবার মৌরিখোলার মাঠে যেতে-যেতে হাতিটা হঠাৎ

খেপে গেল। মাহুত কিছুতেই সামলাতে পারে না। রাস্তা ছেড়ে হাতি আমাকে নিয়ে চলল মাঠের ওপর দিয়ে। বেগতিক দেখে হাওদা থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম। হাতি তো চলে গেল মাহুতকে নিয়ে। আমি হাঁটতে-হাঁটতে গিয়ে দেখি এমনি এক নদী। কী ভালো যে লাগল!

তারপর?

বারুমিয়া হাসলেন।...হাতিটা সামনের গাঁয়ে গিয়ে ততক্ষণে হুলস্থূল বাধিয়েছে। আমি পরে সেখানে গিয়ে সব শুনলাম। মাহুতকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছে। তার অবস্থা আধমরা। ভাগ্যিস, সেই গাঁয়ে ছিল এক জমিদারবাড়ি। তাঁদের বন্দুক ছিল। বন্দুকের আওয়াজ করে হাতিটাকে গ্রামছাড়া করা হল। সেখানেই রাতে থাকলাম। খবর পাঠালাম সদরে। দুদিন পরে একটা মাদি হাতি এল নবাবের হাতিশালা থেকে। তখন মত্ত হাতিটা মাঠের পুকুরে গিয়ে পড়েছে। এদিকে গ্রাম একেবারে জনশূন্য।

তারপর কী হল চাচাজি?

মাদি হাতিটাকে দেখে বাহাদুর খাঁ—মানে আমার হাতিটার রাগ পড়ে গেল।

কেন চাচাজি?

বড়ো হও আরও, তখন বুঝবে। প্রকৃতিরই সে আরেক খেলা।

আপনি হাতি চেপে আসেন নি কেন চাচাজি?

এখন যে আমি ছুটিতে।

আমাকে হাতিতে চাপাবেন?

নিশ্চয় চাপাবো।...

চৌধুরি আবদুল বারি ছিলেন এক আশ্চর্য মানুষ। জাফরাগঞ্জে নবাববাহাদুরের দেওয়ানখানায় একটা ঘরে থাকতেন। একেবারে একা মানুষ। মাঝে-মাঝে হঠাৎ কী খেয়ালে চলে আসতেন দূরসম্পর্কের আত্মীয়বাড়ি। দরিয়াবানুর স্বামী ছিলেন তাঁর কী সম্পর্কে ভাই। কয়েকটা দিন হুল্লোড় করে কাটিয়ে যেতেন মৌলাহাটে। সেবার এসে শফিকে তিনি পেয়ে বসেছিলেন। আর শফিও তাঁর প্রতি মনেপ্রাণে আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল।

পরদিন সকালেই মসজিদ থেকে শফিকে ডাকতে এল একটা লোক। শফি গিয়ে দেখেছিল, মসজিদের বারান্দায় গালিচা পেতে বসে আছেন তার আব্বা। একটু তফাতে মেঝেয় গ্রামের মুরুব্বিরা সসম্ভ্রমে বসে আছে। আর গালিচার একধারে বসে আছেন বারুমিয়া।

শফি গিয়ে আসসালামু আলাইকুম বললে বদি-উজ্জামান ইশারায় ছেলেকে বসতে বলেছিলেন। বারুমিয়া মিটিমিটি হেসে বলেছিলেন, তোমার স্কুলের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে শফি! আজই তোমাকে হরিণমারা নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন পিরসাহেব।

শফি তার আব্বার দিকে তাকাল। বদিউজ্জামানের হাতে জপমালা তসবিহ। ঠোঁট কাঁপছিল। তসবিহ জপা থামিয়ে মৃদুস্বরে বলেছিলেন, দেওয়ানসাহেব ঠিকই বলেছেন। আমার আপত্তি নেই। ইংরেজের খিৎটানি এলেম কিছু জানা দরকার। তা না হলে ওদের জব্দ করা যাবে না। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের জেহাদ এখনও খতম হয় নি।

শফি দেখল, বারুমিয়ার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটেছে। বারুমিয়া পরমুহূর্তে সেই ভাব লুকিয়ে বললেন, হুজুর পিরসাহেব! আপনি তো জানেন, নবিসাহেব স্বয়ং বলেছেন, এলেম বা বিদ্যাসংগ্রহের জন্য দরকার হলে চীন মুলুকেও যাও।

জি হাঁ। বদিউজ্জামান সমর্থন করলেন। তবে তার চেয়ে বড়ো কথা, আমরা ওহাবি। ইংরেজ আমাদের দুশমন।

জানি হুজুর! বিনয় করে বললেন বারুমিয়া। সেজন্যই তো ইংরেজের বিদ্যা শিখেও ইংরেজের চাকরি নিই নি। মুসলমানের খিদমত করছি।

বদিউজ্জামান বললেন, তবে আপনাদের নবাব-বাহাদুরটি ইংরেজের নফর। সেবার আমাকে তলব দিয়েছিলেন। আমি যাই নি। তাছাড়া ও'রা হলেন শিয়া। ও'রা বলেন, হজরত আলিরই নাকি পয়গম্বরী পাওনা ছিল। ফেরেশতা জিব্রাইল ভুল করে—তওবা, তওবা! ওসব কথা মুখে আনাও পাপ।...

কিছুক্ষণ পরে বাইরে বেরিয়ে বারুমিয়া শফির কাঁধে হাত রেখে চাপা হেসে বললেন, যাক গে। আমার সবিশেষ পরিচয় পিরসাহেব পান নি। পাওয়ার আগেই তোমাকে নিয়ে ভরতি করে তো দিয়ে আসি। চলো, আজ রোজিদের বাড়ি দুমুঠো খেয়ে নেবে। যাবার সময় আম্মাকে বলে আসবে।

দুপুরের আগেই টাপরদেওয়া গোরুর গাড়িতে দুজনে রওনা হয়েছিল বাদশাহি সড়ক ধরে হরিণমারা। শফির মনে প্রবল একটা উত্তেজনা। অথচ সে শান্ত থাকার চেষ্টা করছিল। সবে গ্রীষ্ম এসেছে। ধু-ধু মাঠে চাকার ধুলো উড়িয়ে গাড়িটি ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। শফির মনে হচ্ছিল, এবারকার এই যাওয়াটিই যেন সত্যি-কার নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তার মন নুয়ে পড়ছিল বারুচাচাজির দিকে। আর বারুমিয়া রুক্ষ গ্রীষ্মের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তার রূপ দেখে মগ্ন। এক আশ্চর্য মানুষ!

[ক্রমশ

'পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা' বিষয়ে পাঠকদের কিছু চিঠি আমাদের হাতে জমেছে। পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উপন্যাস কি মিথ্যার শিল্প ?

মারিয়ো ভারগাস লোলসা

অনুবাদ : **অশ্রুকুমার সিকদার**

আমার প্রথম ছোটোগল্প লেখার সময় থেকেই লোকে আমাকে প্রশ্ন করেছে, আমি যা লিখি তা 'সত্য' কিনা। আমার উত্তর অনেক সময় তাদের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটিয়েছে বটে, কিন্তু আমার জবাব যতই আন্তরিক হোক, আমি সব-সময় এই ভেবে খুঁতখুঁত করেছি যে আমার উত্তরটা ঠিক জুতসই হল না।

উপন্যাসটি ভালো না মন্দ—এই ব্যাপারটা জানা যেমন অনেক পাঠকের কাছে জরুরি, তেমনি উপন্যাসটি সত্য না মিথ্যা—এটাও তাদের কাছে জরুরি, এবং অনেক পাঠক জ্ঞাতসারে বা অজানতে প্রশ্ন দুটোকে যুক্ত করে দেখে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হিসপানি ইনক্যুইজিটর হিসপানি-মারকিনি উপনিবেশগুলিতে উপন্যাসের প্রকাশ এবং আমদানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল ; তাদের বক্তব্য ছিল, এইসব অযৌক্তিক, উদ্ভট—ফলত অসত্য গ্রন্থগুলি—ইনডিয়ানদের আত্মিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হতে পারে। ফলে তিনশো বছর ধরে হিসপানি-মারকিনদের পক্ষে উপন্যাস পড়া মানেই ছিল নিষিদ্ধ গ্রন্থ পড়া, আর তাই দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতার পরেই সেখানে প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হতে পেরেছিল (১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে, মেকসিকোতে)। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ, শুধু বিশেষ রচনাকে নয়, নির্বিশেষভাবে একটি সাহিত্য-প্রজাতিকে নিষিদ্ধ করে বলতে চেয়েছিল যে তাদের চোখে ব্যতিক্রমহীন এই বিধি : উপন্যাস সব সময় মিথ্যাবাদী, তারা জীবন সম্বন্ধে উপস্থাপিত করে একটি ভ্রান্ত ধারণা। কয়েক বছর আগে এই স্বৈরাচারী ধর্মান্ধদের বিদ্রূপ করে আমি একটি রচনা লিখেছিলাম। এখন আমার কিন্তু মনে হয় হিসপানি ইনক্যুইজিটররই উপন্যাসের চরিত্র এবং তার ক্ষতিকর প্রবণতা প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিল—সমালোচকদের আগে, ঔপন্যাসিকদেরও আগে।

আসলে সত্যিই উপন্যাস মিথ্যা কথা বলে—না বলে উপায় নেই—কিন্তু এই ব্যাপারটা গোটা সমস্যার একটা অংশমাত্র। অন্য অংশটা হচ্ছে, মিথ্যাভাষণের মধ্য দিয়েই উপন্যাস এক বিচিত্র সত্যকে প্রকাশ করে—এই সত্যকে শুধু গোপন প্রচ্ছন্ন ভঙ্গিতে, যা আদতে সে নয় তারই ছদ্মবেশে প্রকাশ করা সম্ভব। কথাটা অর্থহীন শোনাবে। কিন্তু কথাটা খুবই সরল। কোনো মানুষই তার নিয়তিকে নিয়ে তুষ্ট নয়, সকলেই—ধনী-নির্ধন, সামান্য-অসামান্য, খ্যাত-অখ্যাত নির্বিশেষে—সকলেই চায়, যে জীবন সে যাপন করছে তার পরিবর্তে অন্য রকম জীবন যাপন করতে। (চতুরভাবে) মানুষের এই ক্ষুধা নিবারণ করতেই উপন্যাসের জন্ম। যে জীবন না পাওয়ার বিধি-লিপি মেনে নিতে সে রাজি নয়, মানুষকে সেই জীবনের আস্বাদ দিতেই উপন্যাস লেখা হয়, পড়া হয়। প্রত্যেক উপন্যাসের বীজের মধ্যে নিহিত থাকে বিধিলিপি-প্রত্যাখ্যানের এবং আকাঙ্ক্ষার উপাদান।

তার মানে কি উপন্যাস আর অবাস্তবতা সমার্থক ? তাহলে কনরাডের আত্মসমীক্ষারত জলদস্যুগণ, প্রুস্তের ক্লান্ত-অলস অভিজাতবংশীয়েরা, কাফকার নিরুপাধি নগণ্য আক্রান্ত মানুষেরা, বোর্হেসের গল্পের অধিবিদ্যা-ভাবুক পণ্ডিত চরিত্রগুলি যে আমাদের অভিভূত আকৃষ্ট করে তার কারণ কি এইমাত্র যে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সাদৃশ্য নেই, তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের একাত্মতাসাধন অসম্ভব ? একেবারেই তা নয়। আমাদের খুব সতর্ক হয়ে এগোতে হবে, কারণ উপন্যাসের রাজ্যের সত্য আর মিথ্যার এই সড়কে অনেক ফাঁদ ; প্রত্যেকটি মোহন মরুদ্যান সচরাচর মরীচিকা।

উপন্যাস সদাসর্বদা মিথ্যে কথা বলে, একথা বলার তাৎপর্য আসলে কী ? আমার প্রথম উপন্যাস 'নায়কের কাল' (দ্য টাইম অব দ্য হিরো)-এর ঘটনা, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, যে লিউনসিও প্রাদো সামরিক বিদ্যায়তনে ঘটেছে, সেখানকার অফিসার আর শিক্ষার্থীরা যা ভেবেছিল তা নয়। উপন্যাসটিতে তাদের প্রতিষ্ঠানের মিথ্যা নিন্দা রটানো হয়েছে ভেবে তারা উপন্যাসটিকে আগুনে সমর্পণ করেছিল। অথবা আমার প্রথমা স্ত্রী 'জুলিয়ামাসি ও চিত্রনাট্যরচয়িতা' (আনট জুলিয়া অ্যানড দ্য স্ক্রিপটরাইটার) নামে উপন্যাস পড়ে যা ভেবেছিলেন তাও নয়। তিনি ভুল করে ভেবেছিলেন উপন্যাসটি বুঝি তাঁরই চরিত্রায়ণ ; উপন্যাস সত্যের যে বিকার ঘটিয়েছে তাকে অবিকৃতভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে তাই তিনি বই লিখে প্রকাশ করেছিলেন। দুটি গল্পেই আদতে স্মৃতির চেয়ে বেশি আছে উদ্ভাবন, রূপান্তর, অতিশয়োক্তি, এবং রচনাকালে কখনোই উপন্যাসের পূর্ববর্তী বা বহির্বর্তী ব্যক্তি বা ঘটনার প্রতি আক্ষরিকভাবে বিশ্বস্ত থাকতে আমি চাই নি। দুটি ক্ষেত্রেই, যেসব রচনা আমি লিখেছি তার সব ক্ষেত্রেই আমার স্মৃতিতে জাজ্বল্যমান এবং আমার কল্পনার পক্ষে উদ্দীপক অভিজ্ঞতাপুঞ্জ দিয়ে আমার যাত্রা সূচনা করেছি এবং তারপর কল্পনা দিয়ে যা ঘটিয়ে তুলেছি তা সেই উপাদানের একেবারেই অবিশ্বস্ত প্রতিবিম্ব।

জীবনে যা ঘটে তার পুনরাবৃত্তি করার জন্য নয়, উপন্যাস লেখা হয় সংযোজনের দ্বারা তার রূপান্তর ঘটানোর জন্য। ফরাসি লেখক রেসতিফ দ্য লা ব্রেতোঁর নোভেলাগুলিতে বাস্তবতা যতদূর সম্ভব ফোটোগ্রাফের মতো হতে পারে ততদূর, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি আচার-আচরণের এক তালিকা। কিন্তু আচার-আচরণের সেই নিতান্ত ক্লান্তিকর তালিকার মধ্যে, যেখানে সবকিছুই বাস্তবজীবনের সদৃশ, তার মধ্যেও এসে গেছে অন্য এক ব্যাপার, স্বতন্ত্র, ন্যূনতাময়, এবং বিপ্লবাত্মক—ইহসংসারে পুরুষেরা প্রেমে পড়ে নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শুচিতার বা তাদের শারীরিক সুষমার জন্য নয়, এমন কি আত্মিক মাধুর্যের জন্যও নয়, প্রেমে পড়ে শুধুমাত্র তাদের পদযুগলের সৌন্দর্যের জন্য।

অতটা স্থূলভাবে নয়, অনেক কম প্রকট এবং কম সচেতন ভাবে, প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই বাস্তবের পুনর্নির্মাণ করেন—তার হ্রাসবৃদ্ধি করেন—যেমন শক্তিধর রেসতিফ কৌতুকজনক কৌশলে সম্পাদন করেছিলেন। জীবনের সঙ্গে এই, স্থূল বা সূক্ষ্ম, সংযোজন—যার সাহায্যে ঔপন্যাসিক তাঁর উপরে ভর-করা ভাবনাগুলিকে বস্তুমূর্তি দেন—তারই মধ্যে নিহিত থাকে কথা-সাহিত্যের মৌলিকতা। কত ব্যাপকভাবে উপন্যাসটি নির্বিশেষ প্রয়োজনকে চরিতার্থ করেছে, দেশে-কালে কত পাঠক তাদের নিজস্ব দুর্জ্ঞেয় ভূতগ্রস্ত ভাবনার সঙ্গে জীবনের ওই নিষিদ্ধ অনুপ্রবেশসমূহকে মেলাতে পেরেছে, তারই উপর নির্ভর করে উপন্যাসটির মহিমা। আমি কি আমার উপন্যাসগুলিতে বাস্তব স্মৃতির যথার্থ আনুরূপ্য তৈরি করতে চেয়েছি ? নিশ্চয়ই। কিন্তু যদি বাস্তবিকই ঘটনাগুলি যেমন যথার্থ ঘটেছিল তার যথাযথ বিবরণের বিরক্তিকর কাজে আমি সফল হয়েও থাকি, অথবা সেইসব মানুষকে বর্ণনা করে থাকি, যাদের জীবনী তাদের আদলের সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যায়, তবুও আমার উপন্যাসগুলি যেমনটি আছে তার চেয়ে কম সত্য বা অসত্য হবে না।

উপন্যাসের সত্য বা মিথ্যা উপাখ্যানের দ্বারা অনি-

বার্যভাবে নির্ধারিত হয় না। বরং এই ধারণার দ্বারা নির্ধারিত হয় যে, উপন্যাসের কাহিনী জীবনযাপন নয়, লিখিত ব্যাপার, উপন্যাস জীবন্ত অভিজ্ঞতা নয়, শব্দ দিয়ে রচিত ব্যাপার। ঘটনা, শব্দে সমর্পিত হওয়ামাত্র, গভীরভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যে-রক্তাক্ত যুদ্ধে আমি অংশ নিয়েছি, যে-নারীর গথিক পাশ-মুখ আমি ভালোবেসেছি, এইসব বাস্তবতা একটা জিনিস, অথচ তার বর্ণনা দেওয়ার প্রতীক তো গণনাতীত। কিছুকে গ্রহণ করে, আর বহুকে বর্জন করে, ঔপন্যাসিক একের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান, আর যা বর্ণনা করছেন তার অগণ্য সম্ভাবনা আর রূপান্তরকে বিনষ্ট করে দেন। ঔপন্যাসিক তাই স্বভাবের পরিবর্তন ঘটান, যাকে বর্ণনা করছেন তা হয়ে ওঠে যা বর্ণিত হয়।

আমি এখানে বলছি বাস্তবপন্থী লেখকের কথা, যে সম্প্রদায়ের, বা শাখার, বা ঐতিহ্যের আমিও একজন ; পাঠকেরা যাঁদের উপন্যাসের বর্ণিত ঘটনাকে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোয় সম্ভপর বলে চিনতে পারে। বাস্তবিক এটা মনে হতে পারে যে, উদ্ভটকল্পনার লেখকেরা যাঁরা সামঞ্জস্যহীন, স্পষ্টতই অস্তিত্বহীন জগতের বর্ণনা করেন তাঁদের ক্ষেত্রে বাস্তবতা আর উপন্যাসের সংযোগসূত্র কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও অন্যভাবে এই সমস্যা থাকেই। উদ্ভটকল্পনার সাহিত্যের 'অবাস্তবতা', পাঠকের পক্ষে প্রতীক বা রূপক, অর্থাৎ বাস্তবের, অভিজ্ঞতারই এক প্রতিবিম্ব, যাকে জীবনে সে সম্ভব বলে উপলব্ধি করতে পারে। যেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই যে, একটা উপন্যাসের 'বাস্তবিকতা' বা'উদ্ভটকাল্পনিকতা' উপন্যাসের সত্য আর মিথ্যার মধ্যে সীমারেখা টেনে দেয় না।

ঘটনার উপর শব্দের মুদ্রণ, এই প্রথম রূপান্তরের সঙ্গে আছে আর একটি, সময়ের রূপান্তর—সেটিও কম মৌলিক নয়। বাস্তব জীবন বয়ে চলেছে ছেদহীন, শৃঙ্খলাহীন, উন্মার্গগামী ; প্রত্যেকটি গল্প মিশে যাচ্ছে অন্য নানা গল্পে, ফলে তার কোনো সূত্রপাত নেই, সমাপ্তি নেই। অপরপক্ষে উপন্যাসে-বিধৃত জীবন এমন এক অনুকরণ যেখানে উদ্ভ্রান্ত বিশৃঙ্খলা সুশৃঙ্খল হয়, সংগঠিত হয়, কার্যকারণসূত্র, সূচনা আর সমাপ্তি অর্জন করে। যে-ভাষায় লেখা একমাত্র সেই ভাষার দ্বারা উপন্যাসের পরিধি নির্ণীত হয় না, নির্ণীত হয় তার কালগত বিন্যাসের দ্বারাও, যে প্রণালীতে অস্তিত্ব তার অভ্যন্তরে ঘটে যায়—তার স্তব্ধতা আর লয়বৃদ্ধি, বর্ণিত সময়কে উপস্থাপিত করার জন্য বর্ণনাকারীর ব্যবহৃত কালানুক্রমিক পটভূমিকার দ্বারাও।

ভাষা আর ঘটনার মধ্যে একটা ব্যবধান থাকে, বাস্তব-সময় আর উপন্যাসগত সময়ের মধ্যে সব সময় থাকে এক পরিখা। উপন্যাসগত সময় আসলে এক কৌশল যার দ্বারা সৃষ্টি করা হয় এক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া। তার মধ্যে অতীত বর্তমানের পরে ঘটতে পারে—পরিণাম ঘটে কারণের আগে—যেমন ঘটেছে আলেহো কারপেন্তিয়েরের 'বীজের দিকে যাত্রা' (জারনি টু দ্য সীড) কাহিনীতে ; গল্পটি শুরু হয়েছে এক বৃদ্ধের মৃত্যু থেকে, শেষ হয়েছে মাতৃজঠরে তার অঙ্কুরিত হওয়ায়। অথবা হতে পারে দূর অতীতের কথা যা নিকট-অতীতে বিলীন হয়ে যায় না, যে নিকট-অতীতের কালবিন্দু থেকে অধিকাংশ ধ্রুপদী উপন্যাসে বর্ণনাকারী সচরাচর ঘটনা বর্ণনা করে। অথবা হতে পারে শাশ্বত বর্তমান, অতীতহীন, ভবিষ্যৎহীন, যেমন স্যামুয়েল বেকেটের কথাসাহিত্যে। অথবা হতে পারে এক গোলকধাঁধা, যেখানে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সহাবস্থান করে, আবার পরস্পরকে বিনাশও করে, যেমন ফকনরের 'দ্য সাউনভ অ্যানড দ্য ফিউরি' উপন্যাসে।

প্রত্যেক উপন্যাসের একটা সূচনা আছে, একটা সমাপ্তি আছে। সবচেয়ে শিথিলবন্ধ, সংলগ্নতাহীন উপন্যাসেও জীবন একটা তাৎপর্য পায়, কারণ সেখানে এমন একটা পশ্চাৎপট আমরা অর্জন করি যা যে-বাস্তব-জীবনে আমরা মগ্ন হয়ে থাকি তার মধ্যে একেবারেই অলভ্য। এই শৃঙ্খলা একটা উদ্ভাবন এবং তা ঔপন্যাসিকের সংযোজন। ঔপন্যাসিক, এই প্রতারক জীবনকে পুনঃসৃজনের ভান করেন, আদতে জীবনকে তিনি শোধন করে নেন। উপন্যাস বিশ্বাসঘাতকের মতো কখনো সূক্ষ্মভাবে, কখনো বা নির্মমভাবে, জীবনকে ফাঁস করে দেয় ; ভাষার তন্তুর মধ্যে তাকে ধারণ করে তার আয়তনকে সীমাবদ্ধ করে, পাঠকের হাতের মুঠোয় এনে দেয়। ফলে পাঠক জীবনকে বিচার করতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, সর্বোপরি যে নিরাপত্তা বাস্তবজীবনে দুর্লভ সেই নিরাপত্তায় সে তার সঙ্গে ওঠাবসা করতে পারে।

উপন্যাস, সাংবাদিক প্রতিবেদন আর ইতিহাস কোন্ দিক থেকে ভিন্নতাধর্মী ? সবই তো ভাষার নির্মাণ, তাই নয় ? সব ক্ষেত্রেই বিবরণের কৃত্রিম কালের মধ্যে বাস্তব-কালের সীমাহীন খরস্রোতকেই ধারণ করা হয় না কি ? বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার বিরুদ্ধতাধর্মী পদ্ধতিগুলিই আলোচ্য এখানে : উপন্যাস জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে অতিক্রম করে যায়, অন্য সব শাখা ক্ষান্তিহীনভাবে জীবনের দাসত্ব করে। সততার আর প্রতারণার ধারণা এই দুই ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে কাজ করে। সাংবাদিকতায় আর ইতিহাসে তা নির্ভর করে রচনা আর সংশিলষ্ট বাস্তবতার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর : যত নিকটবর্তী সম্পর্ক তত সত্য, যত দূরবর্তী তত মিথ্যা। যখন বলা হয় মিশেলের 'ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস' (হিসট্রি অব দ্য ফ্রেনচ রেভলিউশন) অথবা প্রেসকটের 'কঙকোয়েসট অব পেরু' 'উপন্যাসধর্মী' তখন সেটা সমালোচনা, ইঙ্গিত করা হচ্ছে গুরুত্বের অভাবের দিকে। নেপোলিয়নের যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে 'যুদ্ধ ও শান্তি' (ওয়র অ্যানড পীস) উপন্যাসে ঐতিহাসিক তথ্যের ভুলভ্রান্তির তালিকা রচনা একেবারেই সময়ের অপচয়—কারণ উপন্যাসের সত্য তথ্যের উপর নির্ভর করে না।

তাহলে কিসের উপরে নিভর করে ? নির্ভর করে, তার রাজি করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার উপর, তার কল্পনার চূড়ান্ত সঞ্চার-ক্ষমতার উপর, তার জাদুকরী দক্ষতার উপর। প্রত্যেকটি সার্থক উপন্যাস সত্যবাদী, প্রত্যেকটি ব্যর্থ উপন্যাস মিথ্যা কথা বলে। উপন্যাস সত্য কথা বলে মানে পাঠক একটি অধ্যাসকে অভিজ্ঞতা হিসাবে অনুভব করে, আর মিথ্যা কথা বলে মানে সেই চাতুর্য ঘটাতে অক্ষম হয়। উপন্যাস তাই একটি অ-নৈতিক সাহিত্য-প্রজাতি, অথবা বলা যায়, তার নীতিবোধ একেবারেই তার নিজস্ব, সেখানে সত্য আর মিথ্যা বিশুদ্ধ নান্দনিক ধারণামাত্র।

আমার আগের কথাগুলো থেকে মনে হতে পারে উপন্যাস এক নিরর্থক নির্মাণ। এমন এক ভোজবাজি যার উত্তরণ নেই। অযৌক্তিক শোনাতে পারে, কিন্তু আসলে বিপরীতটাই সত্য যে, উপন্যাসের শিকড় নিহিত সেই মানবিক অভিজ্ঞতায়, যার থেকে উপন্যাস প্রাণশক্তি আহরণ করে এবং তাকেই আবার পুষ্ট করে তোলে। উপন্যাস যা বলে তাকে আক্ষরিকভাবে মেনে নেবার, ঔপন্যাসিক যেভাবে বর্ণনা করেন জীবন আসলে সেই-রকমই, একথা মেনে নেওয়ার মধ্যে বিপদের আশঙ্কা থাকে—উপন্যাসের ইতিহাসের এটা একটা পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ। নাইটদের বীরোচিত আচরণের বই পড়ে ডন কুইহোটির মস্তিষ্কবিকার ঘটেছিল এবং সে হাওয়া-কলকে বর্শায় বিদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়েছিল, আর এমা বোভারির ট্র্যাজেডি ঘটত না, যদি সে তার পঠিত রোম্যানটিক উপন্যাসের নায়িকাদের আদলে নিজেকে গড়ে তুলতে চেষ্টা না করত।

উপন্যাসে আর বাস্তবে কোনো ভেদ নেই, এমন প্রত্যয়ের ফলেই অলনসো কুইজানো এবং এমা বোভারিকে ভয়ংকর বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেইজন্যে আমরা কি তাদের দোষী সাব্যস্ত করি ? না, বরং তাদের কাহিনী আমাদের অভিভূত স্তম্ভিত করে ; উপন্যাসকেই জীবন করে তোলার এই অদম্য প্রতিজ্ঞা যেন এক আদর্শায়িত প্রবণতাকেই ব্যক্তিত্ব দেয় এবং তা আমাদের প্রজাতিকেই সম্মানিত করে। যেমনটি আছি তার থেকে অন্যরকম হওয়ার আগ্রহ মানবিক উচ্চাশার চূড়ান্ত রূপ। তারই থেকে জন্ম নিয়েছে লিখিত ইতিহাসের যা কিছু মহত্তম এবং হীনতম। কথাসাহিত্যও তারই অন্তর্গত।

যখন আমরা উপন্যাস পড়ি, তখন আমরা শুধু আমরা থাকি না, তদতিরিক্তভাবে হয়ে উঠি সেই-সব জাদুগ্রস্ত মানুষ যাদের মধ্যে ঔপন্যাসিক আমাদের প্রেরণ করেন। এই প্রেরণ আসলে এক রূপান্তর। আমাদের জীবনের শ্বাসরোধকর অবরুদ্ধতা খুলে যায়, আমরা অন্য কিছু হতে এগিয়ে যাই, সেইসব অন্য লোকের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বেরিয়ে পড়ি, যেগুলি উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। এক বিস্ময়কর স্বপ্ন, কল্পনার প্রতিমা, উপন্যাস আমাদের পূর্ণাঙ্গ করে—আমরা যারা খণ্ডিত বিকলাঙ্গ মানুষ, যারা একটিমাত্র জীবন লাভের এবং সহস্র জীবনকে কামনা করার ক্ষমতার ভয়ংকর দ্বৈধতায় ভারাক্রান্ত। একদিকে আমাদের বাস্তব জীবন, অন্যদিকে আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনা দাবি করছে জীবন হোক আরো ঐশ্বর্যময় আরো বিচিত্র—এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান সেই হল উপন্যাসের এলাকা।

একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদ আছে প্রত্যেকটি উপন্যাসের কেন্দ্রে। লেখকেরা ওইগুলি রচনা করেন, যেহেতু ওই-রকম জীবনযাপন তাঁদের সাধ্যের অতীত। আর তাঁদের অনুগত পাঠকেরা সেই কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে সেই মুখশ্রীর এবং সেই অভিযানের মুখোমুখি হয় যা তাদের নিজের জীবনকে সমুন্নত করার জন্যে জরুরি। এটাই হচ্ছে সেই সত্য যাকে উপন্যাসের মিথ্যা প্রকাশ করে—আসলে সেই মিথ্যা আমরা নিজেরাই, সে মিথ্যা আমাদের সান্ত্বনা দেয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষা আর ব্যর্থতাবোধের ক্ষতিপূরণ করে। তাহলে উপন্যাস যে-সমাজের উৎপাদন সেই সমাজের সাক্ষ্য হিসাবে উপন্যাস কতটা বিশ্বাস-যোগ্য? সত্যিই কি মানুষগুলি বাস্তবে অমনিই ছিল? তারা ওইরকম ছিল, এই অর্থে যে তারা ওইরকমই হতে চেয়েছিল, তারা মনে-মনে এইভাবেই নিজেদের প্রেম করতে, পীড়িত হতে, এবং আনন্দ করতে দেখেছিল। ওই মিথ্যাগুলি তাদের জীবনের দলিল রচনা করে নি, দলিল রচনা করেছে বরং তাদের চালনকারী অপদেবতার—সে স্বপ্ন তাদের মাতাল করেছিল এবং তাদের যাপিত জীবনকে সহনীয় করে তুলেছিল। একটা যুগে তো শুধু রক্তমাংসের মানুষ বসবাস করে না, কাল্পনিক প্রাণীরাও বসবাস করে, যাদের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে সেই মানুষেরা সীমাবদ্ধতার গণ্ডি থেকে অব্যাহতি পায়।

উপন্যাসের মিথ্যাচার নিরর্থক নয়—সেই মিথ্যাচার জীবনের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে। যখন জীবনকে মনে হয় পরিপূর্ণ এবং পরমতাময়, আর মানুষ যখন সর্ব-গ্রাসী প্রত্যয়ের প্রেরণায় নিয়তির কাছে সমর্পিতপ্রাণ হয়, তখন উপন্যাস কোনো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করে না। ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে জন্ম নেয় কাব্য আর নাটক, কিন্তু উপন্যাস জন্ম নেয় না। প্রত্যয় যেখানে সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে উপন্যাস সেই সমাজের শিল্প; যখন কোনো কিছুতে বিশ্বাস করা জরুরি, যখন অদ্বৈত, আশ্বাসময়, পরমা-দর্শের স্থান নিয়েছে ইহজীবন আর পরলোক সম্বন্ধে এক ভঙ্গুর আর সংশয়াপন্ন উপলব্ধি।

প্রত্যেক উপন্যাস শুধু অ-নৈতিক নয়, সে তার ক্ষেত্রে এক ধরনের সন্দেহবাদকে লালন করে। যখন ধর্মীয় সংস্কৃতি সংকটাপন্ন হয়, তখন মনে হয় জীবনের শৃঙ্খলা-ময় বিন্যাস, প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস এবং নীতিসূত্র অবলুপ্ত হয়েছে, সবকিছুই উন্মার্গগামী। সেই হচ্ছে উপন্যাস রচনার সবচেয়ে অনুকূল সময়। সেই বিশেষ সময়ে উপন্যাসের কৃত্রিম শৃঙ্খলা আশ্রয় আর সুরক্ষার আশ্বাস দেয়, আর সেইসব ক্ষুধা আর আতঙ্ককে মুক্তি দেয়, বাস্তবজীবন যাকে প্রশ্রয় দেয় কিন্তু পরিতৃপ্ত করতে বা নিরাকরণ করতে পারে না। উপন্যাস হচ্ছে জীবনের ক্ষণকালীন বিকল্প। বাস্তবে নেমে আসা মানেই নির্মম-ভাবে হতদরিদ্র হয়ে যাওয়া, প্রমাণ হয়ে যাওয়া যে আমরা যে-স্বপ্ন দেখছিলাম আর তুলনায় আমরা ন্যূন। তার মানে, উপন্যাস কল্পনাকে উদ্দীপিত করে, আমাদের মানসিক অতৃপ্তির যেমন হ্রাস ঘটায়, তেমনি যুগপৎ তাকে উত্তেজিত করে।

হিসপানি ইনকুইজিশন বিপদের ভয়ানকতা বুঝতে পেরেছিল। যে-জীবন আমরা বাস্তবে যাপন করি না, সেই জীবন উপন্যাসের মাধ্যমে যাপন করার মধ্যে নিহিত থাকে উৎকণ্ঠার উৎস, অস্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনতা, যা বিদ্রোহী মনোভাবে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনমনীয় মনো-ভাবে রূপান্তরিত হতে পারে। যেসব শাসনতন্ত্র জীবনকে সামূহিকভাবে শৃঙ্খলিত করতে উৎসুক, বোঝাই যায় তারা কেন উপন্যাসকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। আপন সত্তার বাইরে বেরিয়ে আসা, অন্তত অধ্যাসের মধ্যেও অন্য হতে পারা, ক্রীতদাসত্ব লঘু করার একটা উপায়, স্বাধীনতার ঝুঁকি উপলব্ধি করতে পারার একটা উপায়।

নিউ ইয়রক টাইমস বুক রিভিউ পত্রিকায় ৭ অকটোবর ১৯৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ইজ ফিকশন দি আর্ট অব লাইয়িং' প্রবন্ধের অনুবাদ।

গ্রন্থসমালোচনা

সনাতন হিন্দুধর্মের মহিমা নিয়ে উচ্ছ্বাস

Vaishnava Sects. Shaiva Sects, Mother Worship by Swami Tattvananda. Firma KLM Private Limited. Rs Forty.

গ্রন্থটির নামে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, সেই তিনটি পরিচ্ছেদেই এটি বিভক্ত। এ তিনটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বহু ছোটো-ছোটো উপ-সম্প্রদায়ের নাম, আর কখনো-কখনো তাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও আছে। শৈব সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে তথ্য কিছু বেশি আছে, বৈষ্ণব এবং শাক্ত উপ-সম্প্রদায়গুলির নাম আর অতি সং-ক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কোনো-কোনো প্রসঙ্গে ভৌগোলিক পটভূমিকা সামান্য কিছু পাওয়া যায়। বিশেষত শৈব দলগুলির সম্বন্ধে; বিভিন্ন ধরনের লিঙ্গ এবং লিঙ্গপূজার সংবাদও ওই অংশে আছে। ২৭-৪১ পৃষ্ঠায় বৈষ্ণব উপসম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে।

এ বইটিতে তথ্যগত ভ্রান্তি এত বিস্তর যে পড়তে বসে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। চারটি বৈদিক সংহিতাতেই বিষ্ণু-আরাধনার কথা আছে, (পৃষ্ঠা ১)—এ উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন নয় বেদের বিষ্ণুর "পাদপদ্মে" বিশ্ব আশ্রিত (পৃষ্ঠা ১। 'ব্রহ্ম' বা কৈবল্য" উপনিষৎ দিয়ে প্রাচীন কিছু তথ্য প্রতিপন্ন করা যায় না, কারণ, দুটিই অত্যন্ত অর্বাচীন। বৈষ্ণব উপসম্প্র-দায়গুলির বিভাগে একই সম্প্রদায়ের নাম একাধিকবার উল্লিখিত, যেমন পঞ্চরাত্র দুবার (পৃ ২ ও ৮), এবং কয়েকটির শুধু নামই উল্লিখিত হয়েছে, তথ্য কিছু নেই। পঞ্চরাত্রের ক্রমগুলি এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। কবীর, দাদু প্রসঙ্গে ইসলামের উল্লেখ অপরিহার্য ছিল, কিন্তু গ্রন্থকার সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব।

তেনকলই সম্বন্ধে বলা আছে: দে ডু নট অ্যাকসেপট এনি ফরম (পৃ ৩৩)—এর অর্থ কী? বড়কলই সম্বন্ধে তথ্যের পুনরুক্তি আছে ১০, ৩১ ও ৩৩ পৃষ্ঠায়। বৈষ্ণব দন্ডী, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ইত্যাদি বিভাগ স্পষ্ট বা পর-স্পরনিরপেক্ষ নয়। শৈবধর্মের উৎ-পত্তি ও বিবর্তন (৪৪-৫৩ পৃ) সম্বন্ধে উক্তিগুলি বর্তমান গবেষণায় লব্ধ জ্ঞানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চিরাচরিত অনৈতিহাসিক মত স্থাপন করতে চেয়েছে। ৪৯ পৃষ্ঠায় শুধু 'তৈত্তিরীয়' বলে যে শাস্ত্রের উল্লেখ, তা সংহিতা, না ব্রাহ্মণ, না উপনিষৎ বোঝবার কোনো উপায় নেই। শিব-লিঙ্গবিভাগেও বহু পুনরুক্তি আছে। আত্মজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি বলা (৬৬ পৃ) অশাস্ত্রীয়। শংকরাচার্য সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন—এমন কথা (৭২ পৃ) অযৌক্তিক, কারণ শংকরা-চার্য ধর্মসংস্থাপক ছিলেন না, এক দর্শনপ্রস্থানের প্রবর্তকমাত্র ছিলেন এবং সেটাও সর্বসম্প্রদায়স্বীকৃত নয়। ৯৩ পৃষ্ঠায় আছে, ডেথ অব ওলড ম্যান ইন ক্রিশ্চিয়ানিটি; বলা বাহুল্য, খ্রীষ্টধর্মে তেমন কোনো বৃদ্ধের মৃত্যুর কথা নেই; সন্ত পলের উক্তির উল্লেখ যদি হয়ে থাকে তো তাও এ প্রসঙ্গে অপপ্রযুক্ত। দেবী-উপাসনা প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতে নারীর উচ্চস্থান (৯৭ পৃ) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক উক্তিটি, বা বেদে মাতৃরূপিণী দেবীর উপাসনা (১০০ পৃ) তথ্যগতভাবে ভ্রান্ত। ১০১ পৃষ্ঠায় উপনিষদের উক্তি সামবেদে আরোপিত। শক্তি-উপাসনার উৎস যদি অথর্ববেদে থেকেও থাকে (সংশয়িত), তবু তারও মূল যে প্রাগার্য ধর্মবিশ্বাসে আর আচরণে, সেকথা কুত্রাপি উচ্চারিত হয় নি।

বিষয়বস্তু ছাড়াও বইটিকে অপাঠ্য করে তুলেছে পদে-পদে অজস্র বানান-ভুল, এগুলি সংখ্যায় এত বেশি যে পৃথক উল্লেখ সম্ভব নয়; পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, বৈখানস, বানপ্রস্থ, শতপথ, সার্ষ্টি, শান্তি, কৌশিকী, ভীষ্ম ইত্যাদি ছাড়াও প্রায় সর্বত্রই ঘোষবর্ণ অঘোষ হয়েছে দক্ষিণভারতীয় উচ্চা-রণবৈকল্যের ফলে। সূচীপত্র, পাদ-টীকায় উৎসনির্দেশ, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি কিছুই নেই। পড়তে-পড়তে মনে হয় সবগুলি তাৎপর্যপূর্ণ মত আর পথের উদ্ভব দাক্ষিণাত্যেই। যেখানে শাস্ত্র-গ্রন্থের উল্লেখ আছে সেখানে প্রায়ই নেহাত অর্বাচীন গ্রন্থেরই নাম পাই।

সাধারণ মানুষ শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব-ধর্ম সম্বন্ধে যা জানে তার বাইরে এতে যা তথ্য আছে তা যৎসামান্যই; ইতি-হাস, কালনির্ণয় ইত্যাদি কদাচিৎ পাওয়া যায়। লেখার শৈলী ক্লান্তি-কর, ফলে বইটি সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে নি। বারেবারে বলা আছে, হিন্দুধর্মে বহু মতের আশ্রয় আছে; কিন্তু মুশকিল হল বর্তমানে ধর্ম সম্বন্ধে যা গবেষণাসিদ্ধ তথ্য পাওয়া যায়, তাতে দেখি একথা পৃথিবীর সব ধর্ম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। প্রত্যেক অধ্যায়ের শুরুতে 'গেল-গেল' রব, সনাতন হিন্দুধর্ম সংরক্ষণের উদ্বেগ এবং সেই সনাতন ধর্মের মহিমা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস যেমন হাস্যকর তেমনই ক্লান্তি-কর। যুক্তির স্থান উচ্ছ্বাস নিতে পারে না, এ সহজ তথ্যটুকু গ্রন্থকারের

অজ্ঞাত, ফলে সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রমে তিনি একটি তাৎপর্যবর্জিত গতানুগতিক গ্রন্থ রচনা করলেন কার জন্যে? পণ্ডিত এ গ্রন্থকে তাচ্ছিল্য করবেন, ভক্ত নতুন কিছু পাবেন না, অবিশ্বাসী-ও একে অবজ্ঞাই করবেন।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

নীচের তলার মানুষের সাহিত্য

হেটো বই হেটো ছড়া—বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যানড পাবলিশার্স লিমিটেড। কলিকাতা-৭০০ ০১৩। পনেরো টাকা।

হয়তো এখনও এক দশক হয় নি, এদেশে খুব জোর দেওয়া হচ্ছে নিম্ন-বর্গের সাহিত্যরচনাগুলির সংগ্রহ আর সংরক্ষণের দিকে। ইউরোপেও 'সাবলটারন স্টাডিজ' কথাটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে খুব একটা শোনা যায় নি। আমাদের বাঙলা ভাষায় অবশ্য নিম্নবর্গের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সৃজন, ছড়া-ধাঁধা-প্রবাদ ইত্যাদি বহুদিন আগেই সংগ্রহ করার প্রেরণা জাগিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ। তবে, তাতে তখন 'নিম্নবর্গ' অভিধাটি লাগানো হয় নি। আসলে, মানুষের মৌলিক সাহিত্য রচনার দুটি স্পষ্ট সরণি। একটি অনভিজাত গ্রামীণ মানুষের সৃষ্টি, যার চলাচল মুখে-মুখে। আর একটি নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বা সামন্তপোষিত শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের রচনা, যার চলাচল পুথির পাতায় বা ছাপানো বইয়ে। এটাও ঠিক যে, উনিশ শতকে বাঙলার শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য কিছুটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। তাঁদের মধ্যে আবার একটা গরিষ্ঠ অংশ ছিলেন ইংরাজি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঘোরতর প্রেমিক। এইজন্য দীর্ঘকাল আমাদের নিম্নবর্গের সৃজনের ধারাটি শিক্ষিত মানুষের কাছে গিয়ে ছিল উপেক্ষিত এবং অবজ্ঞাত। ফলে আমাদের ইতিহাসরচনায়, সামাজিকমূল্যনির্ধারণে, এমনকি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও গ্রামীণ মানুষের মৌখিক রচনাগুলি কাজে লাগানো হয় নি। তার একটা কারণ, সেগুলি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং প্রাপ্তির অপ্রতুলতা। আর-একটা কারণ, উচ্চ সমাজের উন্নাসিকতা।

যাই হোক, সে পরিবেশ আজ আর নেই। এখন হারিয়ে-যাওয়া কালের মন্দির-ভাস্কর, দারুভাস্করদের খোঁজ পড়েছে, পীরফকিরদের সন্ধান চলছে, লালন ফকির নিয়ে চলছে দারুণ তর্ক, পুরানো কালের গ্রামসমাজের বিন্যাস আর কৃষিজীবীদের জীবন নিয়ে বই লেখা হচ্ছে। লোকসংস্কৃতিবিষয়ে শিক্ষিত বাঙালির অতি আগ্রহ এখন তো প্রায় হাস্যকর পর্যায়ে পেঁচৈছে। সিলেটের হাসনরাজার গান আজ কলকাতার সভ্য মানুষের গেয়। গম্ভীরা নিয়ে এই মুহূর্তে শিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে নিরীক্ষা-নাটক চলে। অর্থাৎ কিনা, চলটা এখন অন্যদিকে। শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলা যায়, ঠিক সময়ে আসরে নেমেছেন। সভ্য সমাজ এখন তাঁর বই না পড়লেও মুখে বলবেন, 'বাঃ বাঃ, এই তো চাই।' বাহবা দেবেন কিন্তু পড়বেন না, এটাই এখন বঙ্গীয় পাঠকদের দস্তুর। তার একটা বড়ো প্রমাণ, আমাদের সহস্রাধিক পাঠাগার, সহস্রাধিক বিদ্যালয় মহা-বিদ্যালয় ও অন্যান্য আলয় থাকলেও একটা সত্যিকারের ভালো বাঙলা নিবন্ধের বই (মোটামুটি পনেরো থেকে কুড়ি টাকা দামের) মাত্র হাজার কপি ছেপেও বিকোতে লাগে পাঁচ থেকে দশ বছর। বীরেশ্বরবাবু বেশ কিছুকাল আগে, খুব খেটে, 'জেলেপাড়ার সঙ' বলে যে বইটি লিখেছিলেন তা খুব বাহবা পেলেও বিক্রি তেমন হল কি?

মুখের কথা, এই বিক্রি বা বাহবা—কোনো-কিছুতেই বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো গবেষকদের কিছু আসে যায় না। তাঁরা তাঁদের স্বারোপিত দায়িত্ব পালন করে যান। 'হেটো বই হেটো ছড়া' বইটি যে খুব দরকারি, এবং গত একশো বছরের বাঙলা সমাজ-ইতিহাসের মূল্যনির্ধারণে খুব নির্ভরযোগ্য উপাদান, এ কথাটি বুঝতে এবং ঘোষণা করতে যেন আমাদের দেরি না হয়। এ বই রচনার পেছনে রয়েছে লেখকের তিল-তিল নিষ্ঠা আর ধৈর্য, অনেক বছর আর অনেক সংগ্রহস্থল। ১৯৫০ থেকে ১৯৮৪, এই চৌত্রিশ বছরে লেখাগুলি খণ্ড-ছিন্নভাবে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে আর দৈনিকপত্রে প্রকাশ পেয়েছে এবং আমাদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবার দুই মলাটের মধ্যে ১৭৫ পৃষ্ঠার বইটি করতলগত হল। যাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি আছে, আছে 'হিসট্রি ফ্রম বিলো' সম্পর্কে ভাবাবেগ, তাঁরা এ বই বারবার পড়বেন। তবে এ বই পড়তে হবে সংকলনরূপে, বীরেশ্বরবাবুর বিশ্লেষণগ্রন্থরূপে নয়। কেননা এতে আছে সেইসব অচেনা লেখকের লেখা হেটো ছড়া, যা নামমাত্র দামে চটি বইয়ের আকারে বিকোত নিতান্ত হাটে-বাজারে। এর না আছে চোখ-ধাঁধানো চেহারা, না আছে মনোরম লিখনশৈলী। কিন্তু নির্ভুলভাবে এতে ধরা আছে বাঙলাসমাজের নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রসঙ্গ। তারকেশ্বরের মোহন্তকে নিয়ে কেলেঙ্কারি, কলকাতার কিংবদন্তী, দেবদেবী-মাহাত্ম্য, তীর্থস্থানের কথা, ভোটরঙ্গ, কেচ্ছা—এমন সব বিচিত্র বিষয় নিয়ে অগুনতি ছোটো বই থেকে লেখক এ বই গড়ে তুলেছেন। সংগ্রহের নতুনত্ব আর দীর্ঘদিন ধরে তার চর্চা—দুই কারণেই তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হবে। সেই সঙ্গে দুঃখ পেতে হয় তাঁর এই মন্তব্যে যে, "অনেক হেটো-বই-হেটো ছড়া সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু সব রক্ষা করতে পারি নি। সেইসব বিপুল ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য আমার ছিল না।" যে-কোনো সংস্কৃতিসেবী বীরেশ্বরবাবুর অসহায় মন্তব্যে আঘাত পাবেন। তবু তা নির্মম সত্য।

বইটির সমস্ত গুণগত দিককে সাধুবাদ জানিয়ে কেবল একটি অনুযোগ রাখতে হবে বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। তিনি যেসব হেটো ছড়া সংগ্রহ করেছেন তার কোনো সাহিত্যিক বিচার করেন নি। সব ছড়াই তো ভালো নয়। একটু বেছেগুছে, স্বাদু রচনাগুলি সংকলন করলে ছড়াগুলির গরিমা আর একটু বাড়ত, বইটি পেত জনাদর। কোনো বইয়ের শুধু গবেষণাগত মূল্যের বাইরেও থাকা উচিত সহজ পাঠযোগ্যতা। বীরেশ্বরবাবু পরিশ্রমী সংগ্রাহক, নিষ্ঠাবান সংস্কৃতিসেবী। তাঁর এমনতর মৌলিক প্রয়াস আরও এগিয়ে যাক এমন উৎসাহবাক্য আমরা উচ্চারণ করি; সেইসঙ্গে ভরসা করি, তাঁর ভবিষ্যৎ কাজে যুক্ত হবে সাহিত্যিক বোধ। শুধু লুপ্তপ্রচল রচনার সংকলন-পত্র নয়, তাঁর কাছে আমরা চাই একটা সুখপাঠ্য বই।

সুধীর চক্রবর্তী

শিশুদের নিয়ে ভাবনা

শিশুভাবনা—সম্পাদনা: প্রীতিভূষণ চাকী। ঝিমলি প্রকাশনী ১২ পুরণচাঁদ নাহার অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩। মূল্য পঁচিশ টাকা।

মোট পঁচিশ জনের লেখা নিয়ে বইটি সংকলিত। শিশুদের এক-একটা বিশেষ দিক নিয়েই এক-একজন লেখক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই শিশুদের জন্য লেখেন, অনেকেই ভাবেন। বইটিতে লেখকদের নিজ নিজ ভাবধারায় এক-একটা দিক নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এই বিশেষ দিকগুলির সম্বন্ধে এঁরা অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন এবং লিখেছেন—ছোটোদের দুষ্টামি, গানবাজনায় অনুরাগ, খেলাধুলা, তাদের মনোজগতের নানা বিষয়—যেমন, শিশু অনুকরণপ্রিয় এবং তাদের সহজাত বৃত্তি পরিবেশের উপর নির্ভরশীল ইত্যাদি। রচনাগুলির চিন্তাধারায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

কিন্তু শিশুভাবনা অর্থে শুধুই কি এই! তাদের জন্য যে চিন্তাভাবনা তা নিরূপণ, অথবা কী ভাবে অগ্রসর হলে বা কী ভাবে সহায়তা পেলে তার পূর্ণতা আসতে পারে বা সাধারণ শিশুদের জন্য কী করা গেলে তাদের শারীরিক মানসিক গঠনের প্রস্তুতি হতে পারে, সে বিষয়ের আলোচনা হয় নি। অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত শিশুদের নিয়ে অভিভাবকরা খুব একটা চিন্তাভাবনা করতেন না। শিশুদের কোনো মন, ইচ্ছা বা কোন্ বিষয়ে তারা উৎসুক অথবা আগ্রহী, তা নিয়ে কেউই ভাবতেন না; এসব বিষয় তাঁদের চিন্তায় স্থান পেত না। শিশু একটু বড়ো হলে যা-হয় দুটি খেয়ে বই কোলে করে স্কুলে যাও, যা-হয় শেখো। না পারলে প্রহার খাও। শিশুকে মানুষ করার এইরকম পদ্ধতি এখনও অনেক সাধারণ ঘরে, সংগতিহীন পরিবারে বিদ্যমান। বর্তমানে শহরে বা আধা-শহরে এর কিছু পরিবর্তন হয়েছে—মায়েদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। স্কুলে দেওয়া-নেওয়া, পড়ানো শেখানো, স্কুলের শিক্ষিকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি প্রায় সবকিছুর ভার মায়েরা বহন করছেন—এতে অনেক পরিবারে অনেক কাজ বেড়েছে, সংসারের কাজ কমাতে হয়েছে। কিন্তু এরকম কটা পরিবারে সম্ভব হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায়?

শিশু শিশুই—শহরের শিশু বা গ্রামের শিশু বলে তো তাদের ভাগ করে রাখা যায় না। শিক্ষা বা দায়দায়িত্ব সব শিশুর জন্যই সমান—অবশ্য তা পালন করতে পারছেন কজন? সাধ থাকলেও সাধ্য কোথায়? 'শিশুভাবনা'র লেখকরা প্রায় একমতই হয়েছেন। সব শিশুর মানসিকতার প্রতি, কিন্তু সব-কিছু থেকে সামান্যতম অংশ নিয়েই বা তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারা যাচ্ছে কই? সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে মুষ্টিমেয় শহরের শিশুদের মা বাবা কষ্ট করে বা অনায়াসে যা করতে পারছেন, শহরের বাইরে বা গ্রামে কিছুই তা পারা যাচ্ছে না।

আলোচ্য বইয়ের সব লেখাগুলি (এক-একদিকের চিন্তায়) বেশ উপযুক্ত হলেও বিশেষভাবে মনে দাগ কাটে অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর 'শিশুকে নিয়ে ভাবনা'। বলছিলাম, অন্যান্য লেখকেরা শিশুদের একটা একটা দিক নিয়ে সার্থক আলোচনা করেছেন কিন্তু অমিয়বাবু খোলা মনে, খোলা চোখে হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করেছেন সেটাই তো 'শিশু-ভাবনা'। মুষ্টিমেয় শিশু কিছু পায়—অগণিত শিশু নানা সমস্যায় সেখানে অবহেলিত হচ্ছে, এবং তার থেকে তাদের অনেক সময় মানসিক অবনতিও ঘটছে। লেখক মনেপ্রাণে তা অনুভব করেই মহাভারতের উক্তি তুলে দিয়েছেন।

যেখানে অর্থাৎ যেদেশে বালকেরা

সম্বাদ, ভোজ্য শুধু চোখেই দেখে, খেতে পায় না—অথচ খেতে পাওয়া উচিত ছিল, তার চেয়ে দুঃখময় অবস্থা আর কী হতে পারে। অভুক্ত অপ্রাপণীয় খাদ্যের দিকে শিশু নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—আর তাদের কী হওয়া উচিত—এই কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করি! শিশুভাবনার প্রতিটি লেখা লেখকদের নিজের দিক বা দৃষ্টি থেকে সার্থক, কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি সব শিশুর প্রতি আমরা পরিপূর্ণ দৃষ্টি না দিই—শিশুদের বৃহত্তম অংশ অবহেলায় ধুঁকে মরে—তাহলে আমাদের ভাবনা সার্থক হয় কি? কাজেই শিশুভাবনার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল শিশুদের বৃহত্তম অংশ নিয়ে ভাবনা আর তাদের প্রতিপালনের দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন মন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। শিশুবর্ষ বা দু-একটা অনুষ্ঠান করা দিয়ে কোনো মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়।

সবশেষে আবার বলি, সব কটি লেখাই সুলিখিত, তবে বিষয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি সুবিচার করেছেন শ্রীঅমিয়ভূষণ চক্রবর্তী।

ইন্দিরা দেবী

ঢাকার চিঠি

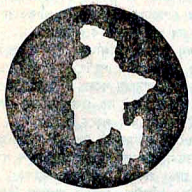

আমাদের উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানমালার প্রথম দিনেই ঢাকার সাহিত্যজগতে ঘটে এক দুঃখজনক ঘটনা : ওই দিনই ভোরে ঢাকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কবি আহসান হাবীব পরলোকগমন করেন। আনন্দের দিনে একটি বেদনাবিধুর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কিন্তু জীবনের সব ঘটনাই স্বাভাবিক বলে শেষ পর্যন্ত ওই দিন দুটো কাজই এখানকার সংস্কৃতিসেবীরা সুচারুরূপেই সম্পন্ন করেন। আহসান হাবীবের শেষকৃত্যের পরপরই চলে শহীদুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা এবং শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন।

শুধু বাংলাদেশেই যে ড. শহীদুল্লাহ সম্পর্কে সেমিনার-সিমপোজিয়াম-বক্তৃতামালা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে তাই নয়, খবর কাগজে দেখলাম, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিও এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্মশতবর্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে আলোচনাসভার আয়োজন করে, এবং তাতে বিশিষ্ট ভাষাবিদ তথা বুদ্ধিজীবীরা তাঁর জীবন এবং কর্মের উপর আলোকপাত করেন। এই উপলক্ষে কলকাতার প্রধান-প্রধান সাহিত্যসাময়িকী ও পত্রপত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে প্রবন্ধ-নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেহেতু আমার এই লেখাটি 'চতুরঙ্গে'র জন্য, 'চতুরঙ্গে'র ১৯৮৪-র অগস্ট সংখ্যাটি বস্তুত এই ভাষাবিদের উপর নিবেদিত। অন্তত তিনটি রচনা ছিল সেখানে তাঁকে কেন্দ্র করে। অন্যান্য পত্রপত্রিকায়ও কমবেশি তাঁর সম্পর্কে লেখা প্রকাশিত হতে দেখে প্রীত হয়েছি।

১৮৮৫ সালে ১০ই জুলাই চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাটে যাঁর জন্ম তিনি পরলোকগমন করেন ঢাকায় ১৩ই জুলাই ১৯৬৯ : দীর্ঘ জীবনের অধিকারী ছিলেন শহীদুল্লাহ। কলকাতা আর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এমন একটি সময়ে যখন বাঙালি মুসলমানঘরের ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা ইসকুলের চৌহদ্দির পর খুব বেশি এগোত না।

ড. শহীদুল্লাহর কর্মজীবন সুদূরবিস্তৃত : হাই ইসকুলের প্রধান শিক্ষক থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, গবেষক ইত্যাদি ছিলেন তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়। অবশ্য শুরুর দিকে বছর চারেক আইনব্যবসায় করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি করাচিতে উরদু উন্নয়ন বোর্ড এবং ঢাকার বাংলা একাডেমীতে উরদু এবং বাংলা অভিধান সংকলন এবং বাংলা একাডেমীতে 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' সম্পাদনার কাজও অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে করেন। তবে তিনি যখন যে-কাজই করেছেন তার সবটাই ভাষা-সাহিত্যকেন্দ্রিক।

তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : লা চাঁন মিস্টিক (১৯২৮), লাঁ সন্‌স ডু বেনগালি (১৯২৮), পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (১৯৬০-৬৫), বাংলা সাহিত্যের কথা (দুইখণ্ডে সম্পন্ন ১৯৫৩-১৯৬৫), বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সঙ্‌স (১৯৪০), সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১৯৬৫), ট্রাডিশনাল কালচার ইন ঈস্ট পাকিস্তান (১৯৬৩), বিদ্যাপতিশতক (১৯৫৪), পদ্মাবতী (১৯৪৬), দিওয়ান-ই-হাফিজ (১৯৩৮), রুবাইত-ই-ওমর খৈয়াম (১৯৪২), ইকবাল (১৯৪৫), শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া (১৯৪২) বাংলা ব্যাকরণ (১৯৩৭), বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭), অমিয়বাণীশতক (১৯৪০), অমর কাব্য (১৯৬৩), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), আমাদের সমস্যা (১৯৫৩), ইসলাম প্রসঙ্গ (১৯৬৩), এসেজ অন ইসলাম (১৯৪৭), রকমারী (১৯৩১) ইত্যাদি। এ ছাড়াও কোরানের তরজমাসহ আরো অনেক পাণ্ডুলিপি রেখে তিনি মারা যান।

বিভিন্ন ভাষায় তাঁর অধিকারের জন্য এবং একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি ভাষাবিদ হিসেবে জীবদ্দশায়ই শহীদুল্লাহ এক প্রবাদ-পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর যে ভাবমূর্তি তথা সম্মান ছিল তাঁর কাজের পরিমাণ সে-তুলনায় কম, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তাতে তাঁকে অবশ্যই খাটো করা হয় না এইজন্যে যে কর্মজীবনের প্রায় পুরো সময়ই শিক্ষাবিস্তারের বা জ্ঞানচর্চার জন্য ব্যয় করেছেন তিনি, তাতে তাঁর নিজের গবেষণামূলক লেখালেখির কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তৎকালীন পূর্ববাংলার বিয়াবান প্রান্তরে তিনি অনেককেই লেখক সাহিত্যিক গবেষক হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই শতকে যাঁরা আমাদের সেরা সাহিত্যিক গবেষক-ভাষাবিদ তাঁরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ড. শহীদুল্লাহর ছাত্র অথবা শিষ্য,

অথবা কোনো-না-কোনো ভাবে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পরামর্শ পেয়েছেন। অবশ্য তাঁর শুধুমাত্র 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' গ্রন্থটির জন্যেই তিনি এ দেশে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। শুধু বাঙলায় নয় —ইংরেজি, ফরাসি, উর্দু নানা ভাষায় তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন, অন্য ভাষা থেকে তিনি বাঙলায় অনুবাদ করেছেন, এসব করতে গিয়ে তাঁর মৌলিক কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

ড. সুকুমার সেনের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত : "... ফানডামেন্টাল রিসার্চের দিকে শহীদুল্লাহ সাহেব বেশি পা বাড়ান নি। তিনি সাধারণ শিক্ষা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে— —যা তাঁর মতোন পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে বাজে কাজ মনে হয়, তাতে লিপ্ত ছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি অনেক লিখেছেন, বাঙলা সাহিত্য এবং বাঙলা ভাষা বিষয়ে, অন্যান্য অনেক বিষয়ে, যা খুব মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-সব রচনায় তাঁর গবেষণাশক্তির গভীর পরিচয় বেশি নেই। তিনি যদি ঢাকায় না যেতেন বা অল্পস্বল্প রাজনীতির আবর্তে না পড়তেন, যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেন, তা হলে তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক নতুন জিনিস পেতুম কোনো সন্দেহ নেই।" প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে না থাকলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, নতুন-প্রতিষ্ঠিত দেশ পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিরা তাঁকে দিয়ে সংখ্যাহীন ইস্কুল পাঠ্যবই রচনা থেকে এমন সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন যা, তাঁর গবেষণা ও সৃজনীশক্তিকে নষ্ট করেছে, ক্ষয় করে দিয়েছে।

সমাজের বৃহত্তর প্রয়োজনে, মৌলিক গবেষণার প্রয়োজনে, জীবনের ছোটোখাটো দায়িত্ব থেকে তাঁর অব্যাহতি নেওয়া উচিত ছিল : এক ধরনের দূরত্ব রক্ষা করা উচিত ছিল ওসব কাজ থেকে। কাজ-করার সুযোগ যে তিনি পান নি তাও নয় ; বর্ষীয়ান, সর্বজনশ্রদ্ধেয়, নমস্য পণ্ডিত বলে অস্বস্তিকর তথা উত্তাল রাজনৈতিক অবস্থার ভেতরেও কোনো সরকারই তাঁকে কখনো বিব্রত করে নি। বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসা আর মমতা ছিল তাঁর নিজের জীবনের মতোই। ধর্মপ্রাণ ছিলেন, ইসলামের মূলনীতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আস্থা ছিল, কোরানের ভাষা আরবির প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ, কিন্তু তবু যে-কোনো ভাষার প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা আর আগ্রহ ছিল প্রচুর। যে-কারণে তিনি বিপুল পরিশ্রমে লিখেছেন নানা ভাষায় : ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসি, আরবি, জারমান, পালি প্রভৃতি। কিন্তু বাঙলা ছিল তাঁর প্রাণপ্রিয় ভাষা। এই ভাষার উন্নতি আর অগ্রগতির জন্য, এই ভাষাকে ব্যবহারিক জীবনে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগের জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। '৫২-র ভাষা-আন্দোলনের সময়কার এবং তার পূর্বের থেকেই তাঁর আপোসহীন ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। তিনি হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে এ শতকের সমস্ত বাঙালি পণ্ডিতদের কাছ থেকে স্বীকৃতি এবং শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

বাংলাদেশ বেতার টেলিভিশনসহ নানা সরকারি আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ড. শহীদুল্লাহর জন্মশতবার্ষিকীতে অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। বাংলা একাডেমী শুধু চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানই নয়, প্রকাশ করেছে একটি স্মারক-গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, ১৯৬৬ সালে এই জ্ঞান-তাপসের ৮০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান তাঁর সম্মানে প্রায় সাড়ে চারশ পৃষ্ঠার একটি ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল : 'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফেলিসিটেশন ভলিউম'। গ্রন্থটির সম্পাদক ছিলেন আরেক সাহিত্যবিশারদ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক। সে-গ্রন্থটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ওতে সম্পাদকের শহীদুল্লাহ সম্পর্কে সুদীর্ঘ, মূল্যবান ভূমিকাটি বাদে অন্য আটাশটি প্রবন্ধের উপজীব্য ছিল সাহিত্যসংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়। এই উপমহাদেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশের পণ্ডিতগণও ওতে লিখেছিলেন। সেই অসামান্য গ্রন্থটির লেখক-তালিকায় ছিলেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. আহমদ হাসান দানী, যুক্তরাজ্যের ডুরহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জন এ. হেউড, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের দেবপ্রসাহ গুহ, আসামের গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সুকুমার বিশ্বাস এবং জে. এম. ভট্টাচার্য, সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের এন. এ. বালুচ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ, আহমদ শরীফ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ, পুনার ড. এস. এম. কাত্রে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কাজী আবদুল মান্নান, কলকাতার ড. হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, ইতালির ড. ভিটো সানিবার্গো, আমেরিকার এস. আর. কাস প্রমুখ। বইটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম এইজন্যে যে, ড. শহীদুল্লাহ চান নি তাঁর জীবদ্দশায় শুধু তাঁর সম্পর্কে প্রশস্তিমূলক লেখা দিয়ে একটি গ্রন্থ ভারাক্রান্ত হোক ; তিনি এবং গ্রন্থটির উদ্যোক্তারা চেয়েছিলেন তাঁর উপলক্ষেই বিশেষজ্ঞরা ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের উপর আলোকপাত করে আমাদের সংস্কৃতির সমৃদ্ধিসাধন করুন। জনপ্রিয়তা এবং বিপুল সম্মান তিনি সকলের কাছ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেয়েছেন কিন্তু আত্ম-প্রচারের মোহ তাঁর ছিল বলে শুনি নি।

এবারের বাংলা একাডেমী -প্রকাশিত 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ'টি ছয়শতাধিক পৃষ্ঠার। এর প্রথম অংশে সংকলিত হয়েছে তাঁর জীবনী ও স্মৃতিচারণমূলক রচনা। শুরুতে এই জ্ঞানতাপসের স্মরণে রচিত গুটিকয় কবিতাও আছে। যাই হোক, জীবনী ও স্মৃতিচারণ অংশে ধৃত হয়েছে ষোলোজন লেখকের লেখা যেখানে তাঁরা বিভিন্ন

কোণ থেকে শহীদুল্লাহর উপর আলো ফেলবার চেষ্টা করেছেন। এখানে যে শুধু বাংলাদেশের লেখক আছেন, তা নয় পশ্চিম বাঙলারও কেউ-কেউ আছেন। উল্লেখযোগ্য লেখকদের তালিকায় আছেন সুকুমার সেন, সৈয়দ আলী আহসান, আহমদ শরীফ, আবদুল কাদির, পবিত্র সরকার, আবদুল হক, সরদার ফজলুল করিম, রফিকুল ইসলাম, অলোক রায়, সুবীর রায়চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ প্রমুখ। এ'রা ব্যক্তি ও কর্মী শহীদুল্লাহর মূল্যায়ন করার প্রয়াস করেছেন।

এ গ্রন্থের আরেক আকর্ষণ ড. শহীদুল্লাহর চব্বিশটি মূল্যবান প্রবন্ধ। এ ছাড়া আছে তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন সভায়, সম্মেলনে প্রদত্ত ছয়টি অভিভাষণ, এবং চারটি ব্যক্তিগত চিঠিপত্র। বলা বাহুল্য ড. শহীদুল্লাহকে প্রায়ই নানা সেমিনার-সিমপোজিয়ামের জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে বা প্রয়োজনে ইংরেজিতে ভাষণ তৈরি করতে হত, এ গ্রন্থে তেমন আটটি লেখা সংকলিত হয়েছে। তবে গ্রন্থের শেষে তাঁর পুত্র আ. জা. ম. তকীয়ুল্লাহ-কৃত 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত রচনা'-র যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা এই স্মারক-গ্রন্থটিকে দিয়েছে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা। বিশেষ যত্নে তিনি এই তালিকা প্রণয়ন করেছে। গ্রন্থটির সম্পাদনা-পরিষদে আছেন শামসুজ্জামান খান, আজহার ইসলাম এবং সেলিনা হোসেন। এ'দের মধ্যে ১২-পৃষ্ঠাব্যাপী 'সম্পাদকীয়'টি লিখেছেন শামসুজ্জামান খান। জন্মশতবার্ষিকীর মতো একটি দুর্লভ উপলক্ষে এ-জাতীয় একটি গ্রন্থের প্রকাশ অপরিহার্য ছিল।

ড. শহীদুল্লাহর বিপুলপরিমাণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেসব পত্রপত্রিকার অনেকগুলোই হয়তো আজ লুপ্ত হবার পথে। এখন আমাদের সংস্কৃতিসেবীদের দায়িত্ব হওয়া উচিত তাঁর সেইসব অগ্রন্থিত রচনাবলি কুড়িয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা। এই মনীষীর সামগ্রিক পরিচয় ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তুলে ধরার স্বার্থে এ কাজটিতে অবিলম্বে হাত দেওয়া দরকার।

আমাদের সাহিত্যজগতের অনেক ব্যাপারেই যে শৃঙ্খলার অভাব তা প্রমাণের জন্য একটি সামান্য ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন : বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রবর্তনের ন বছর পর ইন্তেকাল করলেও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে প্রবন্ধ-গবেষণায় কেন এই পুরস্কার দেওয়া হয় নি তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। অবশ্য একই ভাবে কবি জসীমউদ্দীনও বাংলা একাডেমী পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। গোড়া থেকেই গৌণ লেখকদের পুরস্কৃত করার রেওয়াজ চলে আসছে এই প্রতিষ্ঠানে।

বলা হয় গুণীকে নয়, সম্মান প্রদর্শন করা হয় গুণকেই। ড. শহীদুল্লাহ যেসব গুণে গুণান্বিত ছিলেন তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী দেশে আজও নেই। তিনি ছিলেন বিশ শতকের বাঙলা ভাষার অন্যতম প্রধান ভাষাবিজ্ঞানী এবং শব্দবিজ্ঞান-বিদ। দীর্ঘদিন শহীদুল্লাহ শিক্ষকতা-পেশায় থাকায় এবং বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক কাজে নিয়োজিত থাকায় তাঁর সান্নিধ্যে আর তত্ত্বাবধানে তাঁর অনেক ছাত্র তথা সহকারী কাজ করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েও আজ আমাদের দেশে তাঁর একজনও সার্থক উত্তরাধিকারী নেই। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ভাষাবিজ্ঞানে এবং শব্দবিজ্ঞানে আমাদের দেশে কাজ থেমে আছে ; এবং এই ক্ষেত্র দুটি আজ জনশূন্য তাও নয়। বিচ্ছিন্নভাবে এই দুটি শাস্ত্রে কোনো কোনো মেধাবী কর্মী এখন কাজ করছেন কিন্তু তাঁরা কোনোদিন উচ্চতায় কেউ শহীদুল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছতে পারবেন বলে মনে হয় না। অবশ্য শহীদুল্লাহর যে-সুবিধা ছিল তা এখনকার অনেকেরই নেই : তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ—ভাষাতত্ত্বে কাজ করতে গেলে শুধু মাতৃভাষায় পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে চলবে না, অন্যান্য প্রধান দু-একটি ভাষায় দখল থাকা দরকার।

জানি, একজন শহীদুল্লাহ বা সুনীতিকুমার ক্বচিৎ জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু একটি জীবন্ত তথা প্রাণবন্ত ভাষার উপর কাজ করার প্রয়োজনীয়তা এবং দাবি উপেক্ষা করা যায় না। আমাদের দুজন প্রয়াত অধ্যাপক এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন : মুহম্মদ আবদুল হাই এবং মোদাজ্জেল হায়দার চৌধুরী। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় কোনো-কোনো অধ্যাপককে ভাষাতত্ত্ব বা শব্দবিজ্ঞানের কাজে উৎসাহী হতে দেখা গেছে। তাঁদের মধ্যে কাজী দীন মোহাম্মদ, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, আবুল কালাম, মনজুর মোরশেদ, হুমায়ুন আজাদ, জাহাঙ্গীর তারেক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এ'দের মধ্যে ড. হুমায়ুন আজাদ অপেক্ষাকৃত তরুণ হয়েও অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে ভাষাতত্ত্ব তথা শব্দবিজ্ঞানের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

স্বাধীনতার পরে বিদেশে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতিতে গবেষণামূলক কাজ করার দরোজা খুলে গেছে : অনেক তরুণ অধ্যাপক এই বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য হয় ইতোমধ্যে বিদেশে রয়েছেন অথবা অনেকে যাবার অপেক্ষায় আছেন। এই-ভাবেই আমাদের ভাষাতত্ত্ব তথা শব্দবিজ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে, আশা করা যায়। সৃজনশীল সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে মৌলিক গবেষণামূলক কাজের গুরুত্বও অপরিসীম। অবশ্য গবেষণার নামে চর্বিতচর্বণ ও একে অপরের কারবনকপি হলে তার কোনো তাৎপর্য নেই। যিনি যাই করুন না কেন, তা মৌলিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আমাদের প্রেরণার উৎস হোন, কামনা করি।

সৈয়দ আবুল মকসুদ

আলোচনা

বিরোধী-দলীয় রাজনীতি

একজনের একটা কথা মনে পড়ছে। কিন্তু কথাটা কে বলেছিলেন, কাকে বলেছিলেন, ঠিক এ মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। যাই হোক, কে যেন কাকে বলেছিলেন, "দয়া করে আমি যা বলি, সঙ্গে-সঙ্গে মেনে নিও না। সব বিষয়েই তুমি যদি আমার সঙ্গে একমত হয়ে যাও, কথোপকথন চলবে কী করে?"

আমরা যাকে গণতন্ত্র বলে জানি সেই ধরনের ব্যবস্থা নির্ভর করে নিরন্তর-বহমান কথোপকথনের ওপর। সভ্য, সামাজিক জীবন, রাজনীতি যার একটি প্রকাশ, তখনই সম্ভব হয় যখন দুটি মতের দুটি মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে, এবং বলতে চায়; যখন, গায়ের জোরে নয়, যুক্তির সাহায্যে, কিংবা আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদির সাহায্যে পরস্পরকে নিজের মতে নিয়ে আসবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে, এবং চালিয়ে যেতে চায়। গণতন্ত্র সভ্যতারই দান। কথোপকথন তার অপরিহার্য অঙ্গ।

এবং, বলা বাহুল্য, কথোপকথনের জন্যে অন্তত দুটি পক্ষ প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে দুটি পক্ষ, অর্থাৎ সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ, এ'দের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে, ঐক্যমত না হলেও, এক ধরনের সহমত নিরন্তর সৃষ্টি হয়ে চলবে, একটা মোটামুটি দিক নির্দেশ হবে জাতীয় জীবনের জন্যে। এই হল গণতন্ত্রের কাছে আমাদের প্রত্যাশার একটা দিক। তার আরও একটা দিক আছে। দুই পক্ষ, অর্থাৎ সরকার এবং বিরোধী পক্ষ, দেশবাসীর সঙ্গেও নিরন্তর কথোপকথনে রত থাকবেন, দেশবাসী যাঁরা বিভিন্ন পক্ষকে সমর্থন করেন, তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন চালাবেন, এবং এইভাবে নানা মত আর পথের মধ্যে যেটি যাঁর পছন্দ তাঁর সেটি বেছে নেবার সুযোগ থাকবে। প্রয়োজনবোধে মত এবং পথের পরিবর্তনেরও সুযোগ থাকবে।

আমাদের দেশে বিরোধী পক্ষীয় রাজনীতির একটা মস্ত দুর্বলতা এই যে, না মৌলিক নীতিসমূহের প্রশ্নে, না সেইসব নীতির রূপায়নের রীতি-পদ্ধতি কিংবা তার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থানের প্রশ্নে কোনো বিরোধী পক্ষ এমন কোনো বক্তব্য দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে পারেন নি, যাকে সরকার পক্ষের বক্তব্য থেকে আলাদা করে স্পষ্টভাবে চেনা যায়। নানা বামপন্থী দল এবং গোষ্ঠীর মধ্যে

দেশে বিদেশে

এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বৈপ্লবিকতা আমাদের খুবই পরিচিত। অর্থাৎ, আমি তোমার চেয়ে বেশি বিপ্লবী, কিংবা আমি খাঁটি বিপ্লবী, তুমি মেকি—এইজাতীয় একটা রেষারেষি। সরকারের যে সমালোচনা আমরা বিরোধী পক্ষের মুখে প্রায়ই শুনতে পাই, তাও কতকটা এইজাতীয়। "সরকার মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলেন বটে, কিন্তু আসল সমাজতন্ত্রী আমরাই।" অবশ্য, অসাম্য সবাই দূর করতে চাইবেন, সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীসমূহকে সমুন্নত করতে চাইবেন, এই সর্বজনস্বীকৃত করণীয় কাজ সবাই করতে চাইবেন, কিংবা অন্তত মুখে বলবেন করতে চাই, এ তো অতি স্বাভাবিক। কিন্তু কী পদ্ধতিতে এসব উদ্দেশ্য সাধিত হবে, কী ধরনের সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের প্রয়োজন তার জন্যে, সে বিষয়েও, যদি কিছু মৌলিক মতভেদ থাকে দুই পরস্পর-বিরোধী পক্ষের মধ্যে, অণুবীক্ষণের সাহায্য ছাড়া তাকে দৃষ্টিগোচর করা কঠিন।

তবু, এই সেদিন পর্যন্ত বিরোধী পক্ষকে, নীতির দিক থেকে না হোক, মৌলিক কোনো বক্তব্যের দিক থেকে না হোক, সুস্পষ্ট সরকারবিরোধী মনোভাবের জোরালো প্রকাশের জন্যে, আলাদা করে চেনা যেত। ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিত্বটাই এমন ছিল, এমন ছিল তাঁর স্টাইল, তাঁর কাজকর্মের ধরনধারণ যে সরকারি নীতিকে ছাপিয়ে সরকারের যিনি প্রধান তাঁর চালচলন, রীতিনীতি বিরোধী পক্ষের সামনে মস্ত একটা চ্যালেনজ অহরহ খাড়া করে দিত। এখন কাউকে-কাউকে বলতে শোনা যাচ্ছে, রাজীব গান্ধী নানা দিক থেকে খুবই বুদ্ধিশুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন বটে, কিন্তু মায়ের মতো পরিপক্কতা রাজনীতিতে তিনি এই বয়সে কোথায় পাবেন? নিজের "পরিপক্কতার" কিছু-কিছু ফল ইন্দিরা গান্ধী টের পেতে আরম্ভ করেছিলেন, বেঁচে থাকলে আরও পেতেন। আসলে পরিপক্কতা, যা ভালো তার ভালো, যা মন্দ তার পরিপক্কতা অধিকতর মন্দ।

"অপরিপক্ক" রাজীব গান্ধীর কাজকর্মের, যাকে বলে সাবস্ট্যানস এবং স্টাইল—দুইই অতি পরিপক্ক বিরোধী রাজনীতিকদের সামনে যে চ্যালেনজ এনে হাজির করেছে তার মোকাবিলা করবার কৌশল তাঁরা কখনও শেখেন নি, এবং এই পরিণত বয়সে নতুন করে শিখতে পারবেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহ।

কিছুদিন আগে নয়া দিল্লিতে ন্যাশন্যাল ডেভেলপমেনট কাউনসিলের বৈঠক হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সেই বৈঠকে সপ্তম পরিকল্পনার খসড়ার বিরোধিতা করেন বলে জানা গেছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগ শোনা যায়, প্রধানমন্ত্রী নাকি জ্যোতি বসুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঠিক কোন্ কোন্ বিষয়ে খসড়াটি সম্পর্কে তাঁর আপত্তি, এবং জ্যোতি বসু নাকি সে প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। এই বিবরণ কতদূর সঠিক জানি না, আমাদের জানবার কোনো সুযোগও নেই, তবে এ কথা ঠিক রাজীব গান্ধীকে নিয়ে বিরোধী পক্ষের যে সমস্যা তার কতকটা আঁচ পাওয়া যায় এই ধরনের কাহিনী থেকে, সে কাহিনী যদি পুরোপুরি সত্য নাও হয়।

বিরোধী পক্ষ যদি সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষের যে মর্যাদা তা সত্যিসত্যিই পেতে আরম্ভ করেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষের যা দায়িত্ব তা পালন করবার দায় আর এড়াতে না পারেন, তা হলে বিরোধী রাজনীতি এখন কোথায় দাঁড়াবে? যদি বিরোধী পক্ষ দেখেন সরকার তাঁদের বক্তব্য শুনবার জন্যে কান পেতেছেন, তাঁদের আপত্তি, তাঁদের প্রতিবাদ, তাঁদের পরামর্শ, তাঁদের যুক্তি যথাযোগ্য মর্যাদাসহকারে বিবেচনা করতে প্রস্তুত, তখন, এই অভূতপূর্ব "পরিস্থিতি" তাঁদেরকে যাতে অপ্রস্তুত না করে সেজন্যে তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন কি?

তখন তাঁদের এমন কিছু বলতে হবে যা সরকারের বক্তব্য থেকে আলাদা, এমন কিছু চিন্তাভাবনার পরিচয় দিতে হবে যা সরকার আগে থেকেই ভেবে রাখেন নি, এবং যা সত্যিকারের কোনো বিকল্প—দর্শনের দিক থেকে হোক, নীতির দিক থেকে হোক, পন্থা-পদ্ধতির দিক থেকে হোক।

অবশ্য এর মধ্যে অনেকটাই এখনও 'যদি'-র কথা। একটু সূত্রপাত মাত্র দেখা গিয়েছে, নতুন একটা গণতান্ত্রিক রীতির, বিরোধী পক্ষ সম্পর্কে নতুন একটা গণতন্ত্রসম্মত নীতির। তাতেই বিরোধী শিবিরে একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখা যাচ্ছে। এই রীতি যদি আরও মজবুত হয়ে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে কায়েম হয়ে যায়, তখন বিরোধী পক্ষকে নতুন করে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

দেশবাসীর কাছে গিয়ে নতুন করে তাঁদের দায়িত্বশীল, বাস্তবোপযোগী, রচনাত্মক বক্তব্য এবং কর্মপন্থা হাজির করতে হবে। তারপর, তারই জোরে দেশবাসীর সমর্থন নিয়ে, সত্যিকারের বিরোধী দল হিসেবে নিজেদেরকে সরকারের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে।

তা ছাড়া অবশ্য, সরকার যতদিন থাকবে, তার ভ্রষ্টাচার থাকবে, তার বিচ্যুতি থাকবে হাজার রকমের। তার সমালোচনাও অবশ্য বিরোধী দলেরই দায়িত্ব। কিন্তু শুধুমাত্র সেই ভ্রষ্টাচার এবং অন্যবিধ নানা দোষত্রুটির অপরাধে যদি সরকারের পতন ঘটে, সে হবে আশাতিরিক্ত প্রাপ্তি। বিরোধী দল যদি শুধু তার ভরসায় বসে থাকেন, তাহলে বলতে হবে, সংসদীয় রাজনীতি তাঁদের জন্যে নয়।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ

গত ৭ নভেম্বরের স্টেটসম্যানে একটি অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক প্রতিবেদন বেরিয়েছিল।

তিরুচিরপল্লী বিমানবন্দর থেকে পুডুককোটটাই যাবার রাস্তার ধারে, কীরানুর গ্রামের টিলা, ছোটখাটো পাহাড় ইত্যাদির ফাঁকে এক জায়গায় মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা প্রায় একবর্গ কিলোমিটার জমিতে শ তিনেক যুবক অস্ত্রবিদ্যা, সামরিক কলাকৌশল, গেরিলাযুদ্ধের কায়দাকানুন শিখছেন। তাঁরা সবাই প্রায় শ্রীলঙ্কাবাসী তামিল, তবে তাঁদের মধ্যে অল্পকিছু সিংহলীও আছেন। প্রায় দুর্গের মতো সুরক্ষিত সেই ঘেরা জায়গায় ঢুকবার পথ একটিমাত্র, এবং সেই গেটে পাহারা দিচ্ছে বন্দুকধারী দুই প্রহরী। তামিলনাড়ুর কয়েকটি নির্বাচিত রাজনৈতিক দলের নেতাদের বাইরের অফিস পর্যন্ত আসতে দেওয়া হয়, কিন্তু তার বেশি আর ভেতর দিকে এগোনো নিষেধ।

কীরানুর গ্রামের লোকেরা এই প্রশিক্ষণশিবিরের বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ, কিন্তু স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা নাকি এ সম্পর্কে অনেকবার নালিশ করেছেন। তাতে কোনো ফল হয় নি। স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষ সমস্ত ব্যাপারটার অস্তিত্বই যেন অস্বীকার করেন। অন্য উপায় না দেখে, কয়েকজন নাকি ব্যাপারটা মাদ্রাজে শ্রীলঙ্কার ডেপুটি হাইকমিশনের নজরেও আনবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীলঙ্কা সরকার যে এ বিষয়ে বারবার আপত্তি জানিয়েছেন, ভারত সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন ভারতভূমিতে এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্যে, খবরের কাগজে সে খবরও অনেকবার বেরিয়েছে। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, ভারত সরকারও এ ব্যাপারে অবহিত, এবং এর অবসান করতে আগ্রহী, যদিও প্রকাশ্যে তাঁরা শ্রীলঙ্কার অভিযোগ স্বীকার করে নেন নি। তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। কূটনীতির ক্ষেত্রে কথায় আর কাজে তফাত আদৌ কিছু থাকবে না, এ আশা বড়ো অবাস্তব-ঘেঁষা।

পীপলস লিবারেশন অরগ্যানাইজেশন অব তামিল ইলম, সংক্ষেপে প্লট, এদেশে বেশ কয়েকটি 'টপ সিক্রেট' প্রশিক্ষণশিবির চালিয়ে থাকে। উদ্দেশ্য, শ্রীলঙ্কার বর্তমান সরকারের উচ্ছেদ। ভারত সরকারের মনোভাব এইজাতীয় উদ্যোগের প্রতি বর্তমানে যদিও বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, তামিলনাড়ুর রাজ্যসরকার নাকি একে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, নানারকম সুযোগসুবিধাও দেন। উদ্দেশ্য, সম্ভবত, শ্রীলঙ্কার তামিলদের আত্মীয়স্বজন তামিলনাড়ুর অধিবাসীদের মধ্যে নিজের প্রভাবপ্রতিপত্তি এবং জনপ্রিয়তার সংরক্ষণ এবং পরিপোষণ। কীরানুর প্রশিক্ষণশিবিরের পরিচালক উমা মহেশ্বরন, যিনি মুকুন্দন নামেও

পরিচিত, অবশ্য ভারত সরকারের সাহায্যও সম্ভবত প্রত্যাশা করেন। তিনি বলেছেন আমাদের জন্যে প্রেরিত চার কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র মাদ্রাজ বন্দরকর্তৃপক্ষ আটকে রেখেছেন। ভারত সরকারের পররাষ্ট্রসচিব রমেশ ভান্ডারী যেন তা ছাড়াবার ব্যবস্থা করেন। তিনি আরও বলেছেন, শ্রীলঙ্কা সরকার এবং তামিল উগ্রপন্থীদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রের ভারসাম্য স্থাপিত হওয়া দরকার। অতএব, তাঁর প্রত্যাশা, ভারত সরকার তামিল উগ্রপন্থীদের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র আমদানিতে বাধা দেবেন না।

আসলে এরকম আশা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। তবে, এ চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা আগে যদিও-বা কিছু থেকে থাকে, এখন যে ক্রমশ তা কমে আসছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার একটা প্রধান কারণ, চাপ উলটো দিক থেকেও কম নয়। একদেশের মাটিতে বসে আরেক দেশে সন্ত্রাসসৃষ্টির উদ্যোগ-আয়োজন এখন ভারতের নিজের পক্ষেও যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ। পানজাবের গুরুদাসপুর জেলায় থেটন বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী পনজাবের অধিবাসীদের প্রতি আবেদন করেছেন, সন্ত্রাসবাদ দমনে আপনারা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের জন্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও যে কখনও-কখনও আবশ্যক হয়ে পড়ে, রাজীব গান্ধী সে বিষয়েও যথেষ্ট অবহিত।

অকটোবরের তৃতীয় সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে একমত হন, সন্ত্রাসবাদীরা যাতে আন্তর্জাতিক সীমারেখা পেরিয়ে এদেশে-ওদেশে যাওয়া-আসা না করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। তার আগে, ১৪ই অকটোবর ভারত এবং ব্রিটেন একত্রে দ্বিধাহীন ভাষায় সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে, এবং ঘোষণা করে, অন্য দেশে অস্থিরতার সৃষ্টির চেষ্টায় নিজের দেশের মাটির অপব্যবহার তারা বরদাস্ত করবে না। লনডনে যে ভোজসভায় এই যৌথ সংকল্প ঘোষিত হয়, সেখানেই রাজীব গান্ধী বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, সন্ত্রাসবাদীরা তাদের অলীক স্বপ্ন জিইয়ে রাখতে পারছে কেবলমাত্র বাইরে-থেকে-পাওয়া সাহায্য আর সমর্থনের জোরে। আমাদের আরেক নিকট প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ এদেশের মাটিতে যে অবাঞ্ছিত, সে বিষয়েও ভারত সরকারের মনোভাব ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতিক চরিত্রটা যে ভারতের স্বার্থের প্রতিকূল, এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই, বিশেষত যখন দেখা গেল, বিদেশের নানা জায়গায় উগ্রপন্থী শিখদের কর্মতৎপরতা আমাদের দেশের পক্ষে কতখানি বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারত।

যতটা হতে পারত ততটা হয় নি। তার কারণ, সেইসব বিদেশী রাষ্ট্রে সরকার এ বিষয়ে কঠোর হতে আরম্ভ করেছেন। ব্রিটেনে তো বটেই, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং কানাডাতেও দেখা যাচ্ছে, সরকার শিখ উগ্রপন্থীদের ভারত-বিরোধী নানা উদ্যোগের বিষয়ে আগেকার মতো উদাসীন থাকতে পারছেন না। আমেরিকার অ্যালাবামা রাজ্যে ফ্র্যাঙ্ক ক্যামপারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা-দীক্ষা পেত। 'কণিষ্ক' বিমানের ধ্বংসের সঙ্গে জড়িত বলে যাকে সন্দেহ করা হয়, সেই লাল সিং ক্যামপারের ছাত্রদের মধ্যে একজন। ভারত সরকার এবং আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন, মারকিন কর্তৃপক্ষের কাছে ক্যামপারের ট্রেনিং স্কুল সম্পর্কে অভিযোগ করেন। পরে খবর আসে, সে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ দিকে কানাডাতেও রয়্যাল কানাডিয়ান মাউনটেড পুলিশ এবং উত্তর আমেরিকাস্থিত ভারতীয় অফিসারেরা তদন্ত চালাচ্ছেন ২৩ জুন আইরিশ সাগরে এয়ার ইনডিয়ার বিমান 'কণিষ্ক'র ভেঙে পড়ার ব্যাপারটা নিয়ে; কানাডার পুলিশ ভ্যাঙ্কুভার শহরের উপকণ্ঠে উগ্রপন্থী শিখদের খোদ ঘাঁটিতে হানা দিয়ে সেই ধ্বংস-ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত সন্দেহে দুজন শিখকে গ্রেপ্তার করেছে এবং খুঁজে বের করেছে নানারকম ধ্বংসাত্মক সাজসরনজাম।

সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতির ক্রিয়াকলাপ দমনের জন্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন, সে বিষয়ে সচেতনতার এইরকম কিছু-কিছু লক্ষণ এখন দেখা যাচ্ছে। আবার, নানারকম বাধাও আসছে এই সহযোগিতার পথে। কোথাও জাতীয় স্বার্থচিন্তা বাধাসৃষ্টি করছে, কোথাও বা মতাদর্শ, বা তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়াডর 'খালিস্থান'পন্থী শিখদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সেখানে 'স্বাধীন খালিস্তানী' সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে। অকটোবরের ৩ তারিখে, 'খালিস্তানী' দূতাবাসের উদ্বোধনও সেখানে হয়ে গেছে আনুষ্ঠানিকভাবে। ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস, 'খালিস্তান' প্রতিষ্ঠায় সুদূর ইকুয়াডর রাষ্ট্রের এই আগ্রহের কারণ আর কিছুই নয়—কৃষিতে পশ্চাৎপদ সেই জঙ্গলাকীর্ণ দেশে শিখেরা দলে-দলে যাতে বসতি করেন, চাষবাসের কাজ আরম্ভ করেন, এইমাত্র। এ কাজে শিখদের খ্যাতি এখন বিশ্বব্যাপী।

বিদেশবাসী শিখদের, এমনকি স্বদেশবাসী শিখদেরও কেউ-কেউ যদি নতুন কোনো দেশে গিয়ে সেখানকার জঙ্গল সাফ করে, অনুর্বর জমিতে ফসল ফলাতে পারেন, তাতে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর কল্যাণ বই অকল্যাণ হবে না। কে যেন বলে গেছেন, যেখানে গমের একটি শীষ জন্মাত, সেখানে যে দুটি শীষ ফলাতে পারে, মানবজাতির সেই সবচেয়ে বড়ো উপকারী। এ তো ভালো কথা।

বরং মারাত্মক, ধর্মের কারণে, তত্ত্বের কারণে, মতাদর্শের কারণে সন্ত্রাসবাদের সমর্থন, সহায়তা। বাবা যোগীন্দর সিং সম্প্রতি যে কথা বলেছেন তা শুনলে যে-কোনো সাধারণ মানুষের গা গুলিয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন, "আমরা মনে করি সন্ত্রাসবাদী হত্যাকান্ড 'ওয়াহে গুরু'র অভিপ্রায়। ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাতে কোনো-কোনো লোকের আঘাত লাগতে পারে।" ('অন দি রেকর্ড', স্টেটসম্যান, ৯-১১-৮৫)

অবশ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা না বলে ইতিহাসের অমোঘ বিধান, কিংবা গণমুক্তির অপ্রতিরোধ্য অভিযানের কথা বললে, তখন শুনতে অতটা খারাপ লাগে না। কিন্তু ফলটা কার্যত একই দাঁড়ায়। কোনো-না-কোনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠী নিজেদের হাতে তুলে নেয় মানুষের বাঁচা-মরার ভার। তাঁরাই অভিযোগ আনেন, তাঁরাই বিচার করেন, তাঁরাই দেন প্রাণদন্ড, তাঁরাই গলায় পরান ফাঁসি। আবার এমনও আজকাল প্রায়ই দেখা যায়—যার প্রাণ গেল, তার বিরুদ্ধে কারোরই কোন অভিযোগ নেই, সন্ত্রাসবাদীদেরও নয়। যেমন 'কণিষ্ক'-র সেই শিশুটি, যার খেলার পুতুল আইরিশ সাগরের জলে ভাসছিল, কিংবা কোনো নিরীহ দিল্লীবাসী, যাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিল কোনো প্রাণঘাতী ট্রানজিস্টর রেডিও। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—ডিম না ভেঙে অমলেট বানানো যায় না। এমন ধরনের কথা যিনি বলেন, মনে হয় তাঁর থেকে শত হস্ত দূরে থাকি, কেন না, রক্ত-মাংসের মানুষের মূল্য যাঁর কাছে কম তিনি নির্ভীক বীরপুরুষ হতে পারেন, যেমন অন্যের প্রাণের মায়া করেন না, তেমনি হয়তো নিজের প্রাণের মায়াও না করতে পারেন, হতে পারেন নির্লোভ, নিঃস্বার্থ, কিন্তু দোষে-গুণে জড়ানো, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, ভয়ে-ভালোবাসায়, স্নেহে-মমতায় গড়া যে সাধারণ মানুষ, তার তিনি কেউ নন।

সন্ত্রাসবাদ ভালো না মন্দ, না কি কখনো ভালো কখনো মন্দ, ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে তর্কবিতর্ক অনেক দিন ধরে চলছে। 'আমি যা ভালো মনে করি, তার জন্যে সন্ত্রাস ভালো, তুমি যা ভালো মনে কর, তার জন্যে ভালো নয়, অতিশয় মন্দ'—এ ধরনের মনোভাব এখন এতই প্রচলিত যে, এর মধ্যে আর নতুনত্ব কিছু নেই। রাজনৈতিক সন্ত্রাস, ধর্মীয় সন্ত্রাস, ধর্মীয়-রাজনৈতিক সন্ত্রাস—এর সবই ভালো হতে পারে না। আমি, আমার দল, আমার গোষ্ঠী এর মধ্যে যেটিতে বিশ্বাসী, ধরাধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সেইটিই একমাত্র পথ, যে-কোনো সন্ত্রাসবাদীকে প্রশ্ন করলে এই একটিই উত্তর শোনা যাবে।

এক বিষয়ে তাঁরা সবাই একমত—ডিম না ভাঙলে অমলেট জুটবে না। সমাজটাকে নতুন করে ভেঙে গড়তে হবে, দমন-পীড়ন-শোষণের অবসান চাই, কিংবা, অন্য-কেউ হয়তো বলবেন, আমার ধর্মের গৌরব আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, পাপ এবং অবিশ্বাসের অবসান চাই। সন্ত্রাসের ছুরি চালাতে হবে সমাজদেহের গভীরে, ছত্রভঙ্গ করে দিতে হবে মানুষের নিরাপদ, নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থাকে। একেবারে ভিত্তি থেকে ধসিয়ে দিতে হবে এই ঘুণ-ধরা অবিচার-জীর্ণ কাঠামোটাকে।

সত্যিই তো, সমাজে অন্যায়-অবিচার প্রবল কে তা অস্বীকার করবে? রাষ্ট্রশক্তি দেশে-দেশে এখনও রক্তাক্ত-নখর, তাতে আর সন্দেহ কী? অ্যামনেসটি ইনটারন্যাশন্যাল-এর ১৯৮৪-সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশ, আফ্রিকার ৪১টি দেশের সরকারি মৃত্যু-বাহিনী হাজার-হাজার মানুষকে বন্দী করেছে, নির্যাতন করছে, হত্যা করেছে। উগানডায়, চাদ-এ, ইথিওপিয়া-য় হাজার-হাজার লোককে প্রাণদন্ড দেওয়া হচ্ছে, নয়তো এমনিই খুন করা হচ্ছে, এই সন্দেহে যে তাঁরা সরকার-বিরোধী গেরিলা। দক্ষিণ আফরিকার বহুসংখ্যক লোককে মানবিক-অধিকার-বিরোধী পাস-আইন অনুযায়ী জেলে পোরা হয়েছে।

তা ছাড়া, যেসব দেশে অবস্থা অতটা খারাপ নয়, সেখানেও সমাজে, রাষ্ট্রদেহে দোষত্রুটির অভাব নেই, আরও আছে। কোনও অজুহাতে, কিংবা কোনও অজুহাত ছাড়াই অধিকারের সীমানা ছাড়িয়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এবং প্রতিষ্ঠিত আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা, সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদের এই অস্তাচলগমনের দিনেও, পররাষ্ট্রে প্রাধান্যের লিপ্সা সব রাষ্ট্র কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কাজেই, কোনো রাষ্ট্রশক্তিকে, কিংবা কোনো সামাজিক কাঠামোটাকে নিরতিশয় মন্দ জেনে যদি কেউ দাবি করেন, রাষ্ট্রীয় হিংসাচরণ উপ-রাষ্ট্রীয় হিংসাচরণ দিয়ে, অর্থাৎ স্টেট ভায়লেনসকে সাব-স্টেট ভায়লেনস দিয়ে পরাস্ত করার চেষ্টার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই, বরং ন্যায়সংগত সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সেইটেই একমাত্র পথ, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সে দাবি যুক্তিপূর্ণ।

এ নিয়ে তর্কবিতর্কের শেষ নেই। কিন্তু একটা বাস্তব সত্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না, যদি না জোর করে চোখ বন্ধ করে থাকি। বিপুলসংখ্যক মানুষ সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিরুপদ্রব সামাজিক জীবনই যাপন করতে চান। যদি না কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা ঘোর অন্যায়ের ওপর নিজেকে স্থাপন করে, যদি তার বিচারব্যবস্থা, যতই তা ত্রুটিপূর্ণ হোক, রাষ্ট্রশক্তির পদানত না হয় যদি তার আইন হাজার অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও একটা ন্যায়নীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যদি লোকের মনে এ বিশ্বাস অটুট থাকে, যে অন্যায়ের প্রতিকার, যা মন্দ তাকে খারিজ করবার নিয়মতান্ত্রিক রাস্তা খোলা আছে, ভালোর জায়গায় আরও ভালোকে, কিংবা অন্তত মন্দর জায়গায় অপেক্ষাকৃত কম মন্দকে বেছে নেবার সুযোগ পাব, আজ না হোক কাল—তা হলে, সন্ত্রাস এবং হিংসার পন্থায় তেমন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে আগ্রহী হবেন, এমন লোকের সংখ্যা, অতি নগণ্য হতে বাধ্য। অতএব সেই রাষ্ট্রশক্তির ওপরই দায়িত্ব বর্তায়, সন্ত্রাস-

বাদের হাত থেকে যেমন নিজেকে তেমনি জনসাধারণকেও রক্ষা করবার।

সে দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে গেলে এখনকার এই বিশ্বব্যাপী দ্রুত যোগাযোগ এবং যাতায়াতের দিনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য।

১৫-১১-১৯৮৫

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নাটক

নান্দীকারের ‘মাননীয় বিচারকমণ্ডলী’

নান্দীকারের সাম্প্রতিক নাটক ‘মাননীয় বিচারকমণ্ডলী’। প্রতি বৃহস্পতিবার একাডেমী অব ফাইন আর্টস হলে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়ে চলছে। আকিরো কুরোসাওয়ার ‘রশোমন’ চলচ্চিত্রকে ভিত্তি করে, স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর ভাষান্তরে এবং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর নির্দেশনায় এই বিরতিহীন নাটকটি তিনটি প্রধান চরিত্রকে আবর্তন করে বিন্যস্ত হয়েছে।

জানুবীর নামে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত, একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা আর তাঁরই এককালের পরিচারিকা (যিনি বর্তমানে ওই ক্ষাত্রবীরের স্ত্রী), এই তিনজন মুখ্য চরিত্র। ঘটনাচক্রে ক্ষত্রিয়টির মৃত্যু ঘটে এবং জানুবীর এবং স্ত্রী বিচারকমণ্ডলীর সামনে হাজির হন প্রকৃত ঘটনাটি ব্যক্ত করতে। আর মাধ্যমের সাহায্যে ওই ক্ষত্রিয়যোদ্ধার আত্মাও জানায় ঘটনাটির বিবরণ। লক্ষণীয়, তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ওই ক্ষাত্রবীরের হত্যাকাণ্ডটি বিবৃত। তবে কার বক্তব্য সত্য বলে ধরা হবে?

একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের মঞ্চকে তিনভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এক পাশে বৌদ্ধ ধর্মভিক্ষু, স্থানীয় একজন অধিবাসী, এবং এক ভবঘুরে কেশকার আলোচনা করছেন ওই ক্ষাত্রবীরের হত্যাপ্রসঙ্গটি। অন্য পাশে বিচারসভার দৃশ্য। জানুবীর এবং ক্ষাত্রবীরের স্ত্রী এবং মাধ্যমের সাহায্যে ক্ষত্রিয়টির আত্মা শোনান প্রকৃত ঘটনার বিবরণ। মধ্যিখানে করা হয়েছে বনাঞ্চল—যেখানে মূল হত্যাকাণ্ডটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং এই মঞ্চভাগ করা হয়েছে বেশ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, কখনোই তা দৃষ্টিকটু হয় না। আলোর ব্যবহারও যথাযথ। কখনোই চড়া আলো ব্যবহার করা হয় না। একাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর উপযোগী অভিনয়ে প্রতিটি অভিনেতাই নিশ্চয়ই তারিফ আদায় করে নেবেন। এবং এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে একটি নৃত্যপরিকল্পনা অসিত চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এক নারী এবং একজন পুরুষের মিলিত প্রয়াসে, অবশেষে নারীটির মুখ দিয়ে মাধ্যম তাঁর বিবরণ জানান।

প্রকৃত সত্য অবশ্য ধরা পড়ে, যাকে ঘটনা বলাই উচিত, সেই স্থানীয় অধিবাসীর বিবরণে। কেননা সে ঝোপের আড়ালে বসে চুপচাপ দেখেছিল সেই ঘটনা। এবং একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সে লাভবানও হয়েছিল। কেননা, ক্ষাত্রবীরের তলপেটে-বিঁধে-যাওয়া ওই মণিমাণিক্যখচিত বহুমূল্য তরবারি নিয়ে সে সরে পড়ে। মানুষটির অভাবের সংসার। ওই তরবারিটি পেলে তার সচ্ছল অবস্থা আসা স্বাভাবিক।

আকিরো কুরোসাওয়ার “রশোমন” চলচ্চিত্রে ছিল ঘটনার যাথার্থ্য বিভিন্ন ব্যক্তিমানুষের দৃষ্টিভঙ্গির আদলে কেমন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। যার প্রত্যেককটিই হয়তো সত্যি, কেননা ওই সত্যি সেইসব ব্যক্তিমানুষের ভাবনার গহনে গভীরভাবে বিরাজ করছে। হয়তো সেটি ‘এভিডেনস’ নয়, কিন্তু “ট্রুথ” হবে না কেন? ‘মাননীয় বিচারকমণ্ডলী’ দেখতে-দেখতে আমাদের এই প্রশ্নটিরই সর্বদা মুখোমুখি হতে হয়।

নান্দীকারের এই নাটকের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব হচ্ছে উপস্থাপনা। এবং এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে, রচনাকার এবং নির্দেশক উভয়েরই ধন্যবাদ প্রাপ্য। সমস্ত নাটকটি এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, দর্শকদের যেমন খানিকটা দূরে সরিয়ে রেখে এই অভিনয় করা হয়েছে, অথচ একই সঙ্গে বিশেষ কিছু রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অন্তর্ভুক্তি দর্শকদের শুধুমাত্র অভিনীত দৃশ্যাবলীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার আহ্বান জানায়।

সমসাময়িক গ্রুপ থিয়েটারে সম্প্রতি চিন্তাশীল নাটক অভিনয় করার একটি রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে। এই ‘ওভার-ইনটেলেকচুয়ালাইজেশন’ হয়তো এখন সারা পৃথিবীর থিয়েটারচিত্রেরই একটি বিশেষ চিহ্ন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটারগুলিও এই বিশেষত্বের বাইরে পড়ে নেই। নান্দীকারের এই প্রযোজনাতেও দেখা গেল ‘সাত বছর অনূর্ধ্ব শিশুদের প্রবেশ নিষেধ’ এমনই এক বিজ্ঞপ্তি। বুদ্ধি ও মঞ্চমায়ার আচ্ছন্ন এই অভিনয় কি স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ের প্রতিবন্ধতকায় দাঁড়ায় না?

‘মাননীয় বিচারকমণ্ডলী’তে মুখ্য দুটি চরিত্রই অবশ্য দক্ষ অভিনয় করেছেন। যদিও অসিচালনার দৃশ্যগুলি খানিকটা আড়ষ্ট মনে হয়। তবুও ‘ফিজিক্যাল অ্যাকটিং’ না হলেও, শরীরের অনেক ব্যবহার আছে। প্রায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সংলাপ বলে যাওয়ার মতো এই নাটক নয়। অবশ্য সংলাপের ব্যবহার নিতান্ত কম নয়। যেহেতু আগেই বলেছি, এই নাটকের আবেদন মূলত মানুষের বুদ্ধির কাছে, স্বাভাবিকভাবেই সংলাপের ওপর বেশ জোর দিতে হয়েছে নির্দেশক এবং রচনাকারকে।

বিদেশী নাটক বা বিদেশী পটভূমিকায় ফেলা নাটক, নান্দীকার অতি

সহজেই দেশজ আবহাওয়ায় তৈরি করে নেন। ‘মাননীয় বিচারকমণ্ডলী’ও এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। তাই, নাটকে মাঝেমধ্যেই ঝলসে ওঠে, সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ, উপরতলার লোকেদের নিষ্ঠুর পাশাখেলা সাধারণ মানুষের জীবন বাজি রেখে।

এই নাটকে সংগীতের ব্যবহার খুব উচ্চগ্রামের নয়। পরিমিত ব্যবহার হলেও সেই সংগীত নাটকের আবহ রচনা করতে কতটা সাহায্য করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বেশ মামুলি ধরনের তথাকথিত সাসপেনস তৈরি করার একটা চেষ্টা হয়েছে মাত্র।

আর সবশেষে নাটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, যখন প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসি, একটি জটিল চিন্তায় আমরা মগ্ন হয়ে থাকি। আমাদের প্রত্যেকের অবচেতনে যে-সমস্ত সত্য বিরাজ করছে, তার খোলাখুলি প্রকাশে আমাদের বিব্রত হতে হয় ঠিকই। কিন্তু সেই ‘বিব্রত-মানসিকতায়’ কি ভুগেছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা? নাটকের মধ্য দিয়ে যদি জীবনের সত্যে উপনীত হওয়া যায়, সেই দুর্গম যাত্রাপথের সংগ্রাম ধরা পড়ে কি তাঁদের অভিব্যক্তিতে? প্রশ্নটা তাঁদের কাছেই থাকল। আমরা, দর্শকরা যে স্ট্রাগলের অংশীদার হব, দায়িত্বশীল অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তার থেকে দূরে সরে থাকবেন কেন? হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলেই পরিষ্কার—নাটকের ক্ষেত্রে দর্শকের বা অভিনেতার তেমন বিরাট কোনো ভেদাভেদ নেই, একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের মঞ্চ বা কোনো আঙিনায়—যেখানেই অভিনয় করা হোক না কেন!

বিপ্লবের দূত

সম্প্রতি গণদর্পণের ‘বসন্তের দূত’ নাটক ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে প্রযোজিত হল। প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার তৃপ্তি চৌধুরী মুস্তিস্লাভস্কির “রুমক—দ্য হেরালড অব স্প্রিং” উপন্যাসের একটি নাট্যরূপ দিয়েছেন। এবং উপন্যাসটি রুশ দেশের উনিশশো পাঁচ সালের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক বাউমানের সংগ্রামী জীবনের আখ্যান।

যেহেতু জীবনধর্মী নাটক, সুতরাং এতে একটি সুডৌল কাহিনীরই মঞ্চরূপায়ণ দেখব—এখন আশাই করা উচিত। এবং তার ব্যতিক্রম হয় নি। বাস্তবমুখীন অভিনয় করতে উদগ্রীব ছিলেন সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীই। মঞ্চে একসঙ্গে অনেকে হাজির ছিলেন, রুশদেশের নাগরিক হিসেবে। পোশাকে খানিকটা সেই বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হলেও, ভঙ্গিতে তার অনেকটাই খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবুও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ধন্যবাদ যে, তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছেন।

বাউমানের সংগ্রামী জীবনই এই নাটকের আলেখ্য। বাউমানের ভূমিকায় সুমন্ত্র চৌধুরী স্থিতধী অথচ আবেগদৃপ্ত চরিত্রে তাঁর সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন। এরকম চেষ্টা করেছেন, গাস্তিলিয়ভ এবং কজুবার ভূমিকায় অভিনেতারা। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মুরারি রায়চৌধুরী প্রচুর গানের ব্যবহার করেছেন, এবং সেই সংগীতের মেজাজও ছিল চড়া।

নাটকটি এমনিতেই একটু দীর্ঘ। এবং তা স্বাভাবিকই বটে। সমগ্র পটভূমিকাটি ধরতে চেষ্টা করেছেন নির্দেশক। কিন্তু বলশেভিক এবং মেনশেভিক গোষ্ঠীর যে তাত্ত্বিক বিতর্ক এই নটকটির ভিত্তিভূমিস্বরূপ, তা কিন্তু পরিষ্কার হয় নি। মেনশেভিক গোষ্ঠীর ভিলেন-মাফিক আচরণ কেন, তাও খুব স্পষ্ট নয়। এই ব্যাপারে নির্দেশক একটু খেয়াল রাখলে ভালো করতেন। এবং এই রাজনৈতিক-নেতার জীবন নিয়ে নাটক করতে গেলে, রাজনৈতিক পটভূমিকাটা আরও পরিচ্ছন্ন হলে, দর্শকদের কাছে চরিত্রটা আরও স্পষ্টভাবে ধরা দেয়।

যাত্রায় আজকাল বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের জীবনকাহিনী অবলম্বনে পালারচনা করার বেশ একটা হাওয়া উঠেছে। বাঙলা থিয়েটারেও কখনো-কখনো আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই। তাহলে পার্থক্যটা থাকে কোথায়? নির্দেশক যদি যাত্রা এবং থিয়েটারের মেলবন্ধনে উৎসুক হন, তাহলে অবশ্য অন্য কথা। নাহলে শুধুমাত্র চড়া ধাঁচের অভিনয় করলেই সেটা যাত্রা হবে, অন্যথায় সেটা থিয়েটারপদবাচ্য বলে গণ্য হবে—এ খুব পরিষ্কার সংজ্ঞা নয়। আসলে, জীবনভিত্তিক কাহিনীই হোক বা বিশেষ পরিস্থিতির পরিচয়জ্ঞাপক কোনো ঘটনাই হোক, লক্ষ রাখা উচিত কোন্ মাধ্যমে সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে! এবং এক্ষেত্রে মাধ্যমটা যেহেতু থিয়েটার, সেহেতু থিয়েটারি ভাবনাচিন্তারও কিছু পরিচয় পাব নাটক দেখতে গিয়ে—দর্শক বা সমালোচকদের এ দাবি একেবারে অযৌক্তিক নয়।

দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্রকলা

নিত্যভ্রমণপর চিন্তামণি কর

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, প্রকৃত শিল্প কোনো বিশেষ কালিক পরম্পরা অথবা স্থানিক ভৌগোলিক চতুঃসীমানা আক্রান্ত এক মহাকায় জঙ্গম যান। অর্থাৎ, প্রকৃত প্রস্তাবে, মহৎ শিল্পীর মধ্যে মহত্ত্বের অন্যতম অন্তর্বস্তু হিসেবে থাকবে তাঁর নিত্যভ্রমণপরতা—জাগতিক তথা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে তাঁর কল্পনা এবং মনন হবে সসঙ্গ। বঙ্গজ কবিদের মধ্যে কবি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায়

দেশদেশান্তরের স্বতঃপরিবর্তনশীল প্রাসঙ্গিকতায় তাঁর এই অনবচ্ছিন্ন ভ্রমণমুখী শশব্যস্ততা প্রমাণিত। আধুনিক চিত্রকরদের মধ্যে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপথচারিতার পরিচর্যা করেছিলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ যামিনী রায়, নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথ একতানমনে শুশ্রূষা করলেন দেশজ রীতিকে। এবং বর্তমানে সত্তর-বছর-বয়স্ক শিল্পী চিন্তামণি কর ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ হলে তাঁর নিজের যে একক প্রদর্শনীটি শিল্পপ্রাণ দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছেন তাতেও সেই আন্তর্জাতিক বোধের অকৃপণ আতিথেয়তার আশ্চর্য প্রমাণ।

মোট তিরিশটি ভাস্কর্য, কুড়িটি পেইনটিঙ এবং চল্লিশটি ড্রয়িং দেখে মনে হল শিল্পীর মন ত্রিলোকে ত্রিকালে এক আত্মবিস্মৃত সাধক পরিব্রাজক। দীর্ঘদিন ফ্রানসপ্রবাসী শিল্পীর ড্রয়িংগুলিতে আধুনিক পশ্চিমী মনস্তত্ত্বের জটিলতা। লিথোগ্রাফগুলিতে তিনি বিমূর্তির চর্চা করেছেন সর্বাধিক। পেনসিল-স্কেচগুলিতে অস্তিত্বের মসৃণতা লাবণ্যের উপান্তস্পর্শী, স্বভাবত অতি প্রাঞ্জল তাদের কমিউনিকেশন। কালির রেখায় 'ন্যুড মডেল' এবং 'অবনীন্দ্রনাথের' পোর্ট্রেট, চারকোলের মিডিয়ামে 'ডেসপেয়ার' দর্শনমাত্র রেখে যায় এক দীর্ঘস্থায়ী অভিঘাত। ড্রয়িঙগুলিতে শিল্পীর সুদীর্ঘ প্রবাসযাপনহেতু অপরিত্যাজ্য বৈদেশিকতার আদল।

পেইনটিঙগুলির আশ্চর্য বিস্ময় হল এর স্থিতিস্থাপনা (ইলাসটিসিটি) এবং দ্রুত পরিবর্তনসাপেক্ষতা। বেশ কিছু দেশজ পুরাণ এবং পৌরাণিক প্রত্যয়কে অন্বয় করেছেন শিল্পী—এবং এই সিরিজে গুরু অবনীন্দ্রনাথের ঘরানার সুরটিই প্রধান। 'চৈতন্য ও নিত্যানন্দ', নিমাই পণ্ডিতের টোল, 'কৃষ্ণ এবং গোপিনী', 'কালীয়দমন', 'মায়াদেবীর স্বপ্ন'—এসমস্ত ছবির আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু যুগ এবং কালের প্রেক্ষিতে পূর্ণ ভারতীয়। তাদের বর্ণক্ষেপণ মোটের ওপর ট্র্যাডিশনাল, কোনো অপ্রামাণিক স্বকপোলকল্পনার মিথ্যাভাস নেই—যদিও শিল্পী মুহূর্তান্তরের মধ্যে তাঁর চিত্রভাষাকে সাগর এবং আকাশ পার করে যুগান্তরে, কালান্তরে এক অন্যতর যুদ্ধদীর্ণ বিক্ষত প্রাঙ্গণে নিয়ে যেতে সক্ষম অতি সহজেই। 'কল্কী' এবং 'কিন্নরী' দুটি ছবিতে দেশীয় পৌরাণিক চিন্তা বিদেশী বিমূর্ত ভাবনায় এবং আঙ্গিকে রূপায়িত হয়েছে। 'সিটাডেল' এবং 'ইল্যুশন'-এর জ্যামিতিক শৈলীকে মনে হয় সেজাঁর কিউবিজম-এর অমোঘ ভঙ্গি। 'মিথ' ছবিটিকেও ছুঁয়ে থাকে ইমপ্রেশনিজম-এর শিথিল হাত—যদিও য়ুরোপীয় শিল্পান্দোলনের কোনো সাংগঠনিক ধারার কাছে শিল্পী কেতাবি দীক্ষা গ্রহণ করেন নি। স্বভাবত পরাবাস্তববাদী (সাররিয়্যালিজ্‌ম) কোনো উগ্র দাপটেও শিল্পীর ছবি উৎকেন্দ্রিক নয়। বরঞ্চ কল্পনির্ভর বাস্তববাদ, অবচেতনার নিহিত গহনতায় অপসৃয়মাণ সত্তার নিরন্তর আবিষ্ক্রিয়ার চাপল্যই এখানে ঘোষিত। 'মিসানথ্রোপ' ছবিটি দর্শককে জানিয়েছে এই ক্রান্তদর্শী শিল্পীর কাছে নঞর্থকতাই কাঙ্ক্ষিত সত্য নয়—যদিও এই নিতান্ত খলদৃষ্টি, দুর্বিনীত চোয়াল হয়বদন শয়তানকে উইলিয়াম ব্লেকের পেপারব্যাক সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র মনে হয়। একটি অপাপবিদ্ধ শিশুর মুখের প্রোফাইল অসামান্য প্রাণবন্ত; অন্তঃপুরিকা, 'দিবাস্বপ্ন' বা শিল্পীর 'মায়ের প্রতিকৃতি'—এদেশীয় এবং চূড়ান্ত ফেমিনিন্‌। একটিই মাত্র ল্যান্ডস্কেপ শিল্পী দেখিয়েছেন—তাও ফ্রান্সের 'রবিনসন'।

যে ভাস্কর্যের জগৎ শবসাধনার মহাশ্মশান, তাকেও অঙ্গীকার করেছেন শিল্পী: অ্যালুমিনিয়ম, ব্রোনজ, মারবেল পাথর, টেরাকোঠা, কাঠ, কষ্টিপাথর মিলিয়ে মোট তিরিশটি ভাস্কর্যে মৃত্যুর কঠিন শাসন এবং সংজ্ঞাহীনতার বন্দীদশা থেকে প্রাণকে আবিষ্কার করেছেন শিল্পী। দারুখণ্ডের উপর তক্ষণ 'শক্তি' একটি অসামান্য নির্মাণ। এ ছাড়াও টরসো, অপ্সরা, নায়িকা (ব্রোঞ্জ) 'ফ্রেডা' (মার্বেল), অলোকা, অনুরাধা, ওদালিস্ক্‌ (প্লাস্টার মডেলিং) সফল রূপতপস্যা। প্রতিবারই নিরেট নিস্পন্দ বস্তুখণ্ডের অন্তরের ব্যাকুল মুমুক্ষা মূর্তিতে সজীব অবয়বভাবে ধন্য হয়েছে। ত্রিঋতুর সূক্ষ্ম সংবেদনায় প্রণোদিত শিল্পী গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বসন্ত তিনটি ঋতুকালীন কাজ করেছেন টেরাকোটায় এবং প্লাসটারে।

প্রাচ্যসৈকতে ড্রয়িঙ দিয়ে যে সূত্রপাত হয়েছিল, পরবর্তী কালে প্রতীচী ভাবধারার উদার যোজনায় তার মধ্যে এসেছে আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি আর বিস্মৃতি। কখনো রোম্যানটিক, কখনো নব্য রোম্যানটিক, কখনো বস্তুপ্রাণ, কখনো অ্যাবস্ট্রাকট—যে-কোনো আঙ্গিককেই উন্মুক্ত সংস্কার উন্মুখ প্রজ্ঞার শিল্পী চিন্তামণি আত্মস্থ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রভাবকে তিরস্কার করে তিনি নিজের স্বতন্ত্র শৈলীতে শুদ্ধ ও একক। শিল্পের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত যেন উত্তরকালীনদের কাছে একটি অনুসর্তব্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

বর্ণালী দাস

নানা প্রসঙ্গ

এজরা পাউনড

১৯৮৫ এজরা পাউনডের জন্মশতবার্ষিকীর বছর। আমেরিকার মধ্যপশ্চিমের আইডাহোর তুলনামূলক সাহিত্যের তরুণ, টগবগে ছাত্র একদা আমেরিকা এবং সমস্ত পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে অসংখ্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রতিভা, তাঁর পাগলামি, তাঁর দয়ালুতা, নীচতা সবকিছুই আমরা এখন স্মরণ করব।

Rene Taupin ১৯৩০-এ লিখেছিলেন, "Toute e'tude de la poesie americaine moderne doit commencer par une e'tude des oeuvres critiques et poetiques d'Ezra Pound", যার মোটামুটি সারমর্ম হল এই যে আমেরিকান আধুনিক কবিতার স্কুল বা ধারা পাউনডের সমলোচনা এবং কবিতা থেকেই শুরু হয়েছে। Taupin একেবারে ভুল বলেন নি।

পাউনডের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা কোনো-না-কোনোভাবে উদ্দীপ্ত, প্রভাবিত হয়েছিলেন—যেমন ইয়েটস, এলিয়ট, উইলিয়ম কারলস উইলিয়ামস, এবং আরো অনেকে। পাউনড এক হিসেবে ছিলেন বহুবিচ্ছুরিত প্রতিভা, যা কাভালাকান্তি থেকে কেনেলোসা পর্যন্ত আকীর্ণ, অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তারপরেও ছড়িয়ে পড়েছিল সমকালীন, তরঙ্গোদ্বেল জীবনে।

সাহিত্য সম্পর্কে পাউনডের যে আপ্তবাক্য, বাণী, উক্তি, বা মন্তব্য এখনো আমাদের কাছে জরুরি মনে হয়, তার কয়েকটি নীচে উদ্ধার করছি :

(১) Literature is language charged with meaning. Great literature is simply language charged with meaning to the utmost possible degree.

(২)• The critic who does'nt make a personal statement, in remeasurements he himself has made, is merely an unreliable critic. He is not a measurer but a repeater of other men's results.

(৩) Good writers are those who keep the language efficient. That is to say, keep it accurate, keep it clear.

(৪) An "Image" is that which present an intellectual and emotional complex in an instant of time.

(৫) It is better to present one Image in a lifetime than to produce voluminous works.

(৬) Use no superfluous word, no adjective which does not reveal something.

এফ এস ফ্লিনটের A History of Imagism পড়লে জানা যায় ১৯০৯ সালের ২২শে এপ্রিল তিনি ইমোজিসটদের সঙ্গে যোগ দিলেন, এবং আমরা এ-ও জানি যে কিছুদিন পরে এই আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তারও অনেক দিন পরে আমেরিকান কবি অ্যামি লাওয়েল যখন প্রায় জবরদখল করে নিলেন এই আন্দোলনকে, তখন পাউনড একটু ঠাট্টা করে ইম্যাজিশম-এর নাম দিলেন 'অ্যামিজিশম'। অস্থিরচিত্ত পাউনড কখনো এক বিষয়ে বেশি দিন টিঁকে থাকতে পারেন নি: তাঁর চারিত্রের মধ্যেই ছিল এই অস্থিরতা।

পাউনডের প্রথম দিকের ছিপছিপে, হালকা, তীক্ষ্ম কবিতা অনেকেরই ভালো লাগে, কিন্তু তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাজ 'ক্যানটোজ' বা 'পিসান ক্যানটোজ' অনেকেই পড়েন না, বা পড়লেও বোঝেন না, যদিও তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয়োক্ত কাব্যগ্রন্থটি সরলতর। পাউনড রাজনীতি, অর্থনীতি এসব নিয়েও চর্চা করেছিলেন, অর্থনীতির ওপর বইও লিখেছিলেন, এবং বিশ্বসাহিত্যের সমুদ্রমন্থন করে তাঁর মহাকাব্যপ্রতিম কবিতা লিখলেও তাঁর 'ক্যানটোজ'-এর একটি প্রধান সূত্র হল অর্থনীতির একটি আকর্ষণীয় বিষয়, যাকে পাউনড আপন মনের মাধুরী মিশায়ে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন : 'ইউজারি'। ইহুদিরা টাকার লেনদেন করে যে অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন অনেক দিন আগে, আধুনিক সভ্যতার ধ্বংস ও অবক্ষয়ের কারণ, পাউনডের মতে, তা-ই। তাই তিনি ছিলেন ইহুদি-বিদ্বেষী অ্যানটিসেমিটিক, তাই তিনি ইতালিতে যোগ দিয়েছিলেন ফাসিস্ত মুসোলিনির সঙ্গে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বেতারে বক্তৃতা করবেন সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে, যার মধ্যে তাঁর স্বদেশ আমেরিকাও অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকা তাঁকে যখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল, তখন তাঁর গুণমুগ্ধ সহৃদয়, প্রতিপত্তিশালী লেখকবন্ধুরা তাঁকে পাগল সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ওয়াশিংটনের কাছে একটি উন্মাদাশ্রমে, যেখানে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন এই শতাব্দীর অন্যতম প্রধান কবি এজরা পাউনড। পাগলা-গারদ থেকে বেরিয়ে এসে, পাউনড যে উক্তি করেছিলেন তা খুবই রোমাঞ্চকর—"আমি তো ভেবেছিলাম আমিই পাগল, কিন্তু বেরিয়ে এসে দেখছি বাইরের সবাই একেবারে বদ্ধোন্মাদ।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটস আর পাউনডের ভাব-ভালোবাসা, মান-অভিমান, ঈর্ষা, অসূয়া সব-কিছুই এখন লিপিবদ্ধ হয়েছে, যদিও সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি পাঠক হয়তো সে বিষয়ে অবহিত নন। আমি শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্র-র "খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে" থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি উদ্ধার করছি :

"তাতে অবশ্য বিস্মিত হবার কিছুই নেই, কেননা পাউনড তো সত্যিই অতুলনীয়। ১৯১৭ সালে রিভিয়্যু-এর

অগাস্ট সংখ্যায় পাউনড নিজেই তাঁর সম্পাদিত ঐ 'সারটেন নোবেল প্লেজ অব জাপান' নামক বইটির একটি স্ব-রচিত সমালোচনা প্রকাশ করলেন। এই যুগান্তকারী বইখানার সমালোচনা পাউনডকে করতে হল তার কারণ অবশ্য সহজবোধ্য : সাধারণ শ্রেণীর সমালোচকেরা বইটির (এবং সম্পাদকের) গুরুত্বটা ঠিকমতো উপলব্ধি না-ও করতে পারেন, অথচ বিশ্বসাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই বইটির যথোচিত প্রচার এবং নির্ভুল তাৎপর্য-ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ......কিন্তু যা পাউনডের ব্যাপারেও সত্যি সত্যি বিস্ময়কর এবং কৌতুকজনক তা হলো এই যে, জাপানি নাটকের প্রচার বা তাঁর নিজের সম্পাদনার গুণকীর্তনের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হলেও, এই সমালোচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে একরকম জোর করেই টেনে এনেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে কটূক্তির এক বিচিত্র প্রদর্শনী খুলে বসেছেন। তিনটি লগুড়াঘাতের পর এটি তাঁর শেষ প্রকাশ্য মুখব্যাদান। প্রবন্ধের গোড়াতেই পাউনড বলছেন :

'(The book) is not so important as the Chinese work left by Fenollosa, but on the other hand it is infinitely better than Tagore and the back wash from India, Motokokiyo and the fourteenth century Japanese poets are worth more than Kabir. Fenollosa has given us more than Tagore has'.

(পৃ ২৬২-২৬৩)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি পাউনডের অসূয়া-জাত আক্রমণ, তাঁর ভ্রান্ত রাজনীতি, সবকিছু সত্ত্বেও একথা আমাদের মেনে নিতে হবে যে যাকে আমরা আধুনিক কবিতা বলি তার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা তথা পুরোহিত হলেন এজরা পাউনড। বন্ধুবৎসল, বিহ্বল, বুদ্ধিমান পাউনড একশো বছর আগে জন্মেছিলেন আমেরিকার একটি শহরে। আজ কলকাতা শহরে বসে আমি তাঁকে স্মরণ করলাম।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ক্লোদ সিমোঁ

ফরাসি উপনিবেশ মাদাগাসকার-এর রাজধানী তানানারিভ-এ ১৯১৩ সালের ১০ই অকটোবর ফরাসি নতুন রীতির উপন্যাসের অন্যতম লেখক ক্লোদ সিমোঁর জন্ম। ১৯৮৫ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে তিনি এখন সংবাদ-পত্রের শিরোনাম। তিনি যে কী করে নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন এই নিয়ে বিস্ময় এবং বিতর্ক এখন স্বদেশ ফ্রানস-এ আর বিদেশের বিদগ্ধমহলে চূড়ান্ত।

ফ্রানসে সমালোচকেরা ১৯৫৫ সালে নতুন রীতির উপন্যাসের নামকরণ করলেন নানাভাবে। এই Nouveau Roman এর (নতুন রীতির উপন্যাস) প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন Ecole du Regard (পরীক্ষানিরীক্ষার গোষ্ঠী), Chapelle de Minuit (মধ্যরাত্রির চ্যাপেল—Minuit অবশ্য একটি ছোটো প্রকাশনসংস্থার নাম যেখান থেকে নতুন রীতির অধিকাংশ উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে), Romans de la table rase (খালি টেবিলের উপন্যাস—অর্থাৎ এই লেখকরা পুরোনো ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করে নতুনভাবে শুরু করতে চেয়েছিলেন), Romans blancs (সাদা উপন্যাস) বা Ante romans (অপ উপন্যাস)। এই-সব উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—এঁদের কাহিনীনির্ভরতা খুব—খুব কম। বালজাক প্রমুখদের গল্পের মতো জীবন ধাপে-ধাপে এগোয় না বলেই এইসব লেখকদের দৃঢ় বিশ্বাস। মানুষের জীবন রহস্যময় এবং অনিশ্চয় বলে যা ঘটার সম্ভাবনা ছিল তা না ঘটে উলটো দিকে ঘটনা ছুটে যেতে পারে। সুতরাং এই বিশৃংখল জীবন নিয়ে লিখতে গেলে ভাষা অগোছালো এলোমেলো হতে বাধ্য। তবে এঁদের লেখায় কল্পনার মায়াময় জগৎ কবিতার মতো উঠে এসেছে।

ক্লোদ সিমোঁ এই রীতির অন্যতম উপন্যাস-লেখক হলেও তিনি এঁদের মধ্যে প্রধান নন—বিশেষত Alain RobbeGrillet অ্যালোঁ রবগ্রিয়ে কিংবা Michel Butor মিলেশ বুত যখন রয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কী, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে পর্যন্ত অনেক ফরাসি তাঁর কোনো উপন্যাস পড়েন নি। যাই হোক, আজ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের তালিকা দেওয়া গেল। প্রথম উপন্যাস Le Tricheur (লো ত্রিশ্যর বা প্রতারক) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। দ্বিতীয় উপন্যাস গালিভার ১৯৫২ সালে, তৃতীয়টি ১৯৫৪ সালে —নাম Le Sacre du Printemps বা বসন্তের অভিষেক। এর মধ্যে একটি স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হয়—নাম La Corde raide বা কঠিন রজ্জু। এর পরের উপন্যাসগুলি হল Le Vent (বাতাস) ১৯৫৭, L'herbe (ঘাস) ১৯৫৮ La route des Flandres (ফ্লান্ডারের পথ) ১৯৬০, **La** Palace (প্রাসাদ) ১৯৬২, Histoire (কাহিনী) ১৯৬৭, La battaile de Pharsale (ফারসালের যুদ্ধ) ১৯৬৯, Les Corps Conducteurs কন্ডাকটর-দেহগুলি) ১১৭৯, Triplyques ১৯৭৩, Lecon re Choses ১৯৭৫ এবং Les Georgiques ১৯৮১। এ ছাড়া অন্যধরনের দুটি রচনা Femmes (মহিলারা) ১৯৬৬ এবং Orion aveugles (অন্ধ অরিয়ন) ১৯৭০-এ প্রকাশিত হয়েছে।

ক্লোদ সিমোঁ পারীতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তারপরের পড়াশোনা অকসফোর্ড আর কেমব্রিজে। পড়াশোনা করতে-করতেই শিল্পচর্চায় ঝুঁকে পড়েন এবং শিল্পসংক্রান্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তারপরে সারা ইউ-রোপের এপ্রান্ত ওপ্রান্ত ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হন। এর কিছু-দিন আগে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'প্রতারক' শুরু করেছিলেন ১৯৩৮ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জারমানদের হাতে বন্দী হন এবং শেষ পর্যন্ত পালাতে সক্ষমও হয়েছিলেন। এই যুদ্ধকে ভিত্তি করেই তাঁর সর্বাধিক প্রচারিত উপন্যাস 'ফ্লানডারের পথ'। ১৯৫১ সালে প্রথম-বার দারপরিগ্রহ করেন, কিন্তু সে বিয়ে সুখের হয় নি, এবং অল্পকিছু-দিনের মধ্যে তা ভেঙে যায়। আবার ১৯৭৮ সালে ৬৫ বছর বয়সে দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছেন—এই স্ত্রীর নাম রেয়া কারভাস। তাঁর সাম্প্রতিকতম উপ-ন্যাস Les Georgiques (লে জর্জিক্) উৎসর্গ করেছেন এই রেয়াকে। পিরে-নিজের পাহাড়ি উপত্যকায় পৈতৃক আঙুরচাষের খামারে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে ভালোবাসেন। মাঝে-মাঝে পারীতে এসেও থাকেন।

তাঁর 'ফ্লানডারের পথ'-এর জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই উপ-ন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার বছরেই (১৯৬০) তিনি লেক্সপ্রেস (L'EXPRESS) পুরস্কার পান। এ ছাড়া Histoire (কাহিনী) উপন্যাসের জন্যে ১৯৬৭ সালে মেদিসি পুরস্কার (MEDICIS) পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি ফ্রানসের পুলিটজার গঁকুর (Prix Goncourt) পান নি।

লা রুত্ দে ফ্লন্দর (ফ্লানডারের পথ)-এর নায়ক যুদ্ধে বীরোচিত মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ইচ্ছে করলেই পালাতে পারতেন, কিন্তু তা না করে যুদ্ধে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে গ্রহণ করলেন। তাঁরই তিন অনুগামী যখন বেলজিয়ামে ফ্লানডারের পথে পালিয়ে আসছেন তখন তাদের ছেঁড়া-ছেঁড়া স্মৃতিচারণের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে নায়কের চরিত্র আর চেহারা। নোবেল কমিটি উপ-ন্যাসটিকে পুরস্কার দিতে গিয়ে বলে-ছেন "ক্লোদ সিমোঁ কবি ও শিল্পীর সৃজনশীলতার সঙ্গে তাঁর গভীর সময়-সচেতনতাকে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়ে-ছেন।" তাঁর লেখার মধ্যে পৃথিবীকে ভালোবাসার চলচ্চিত্র দেখা যায় যা অপার কাব্যিক সুষমায় সুন্দর। কখনো-কখনো তাঁকে নিদারুণ রোমানটিক মনে হয়, কখনো বা মনে হয় এক বিমূর্ত শিল্পী, কখনো বা নিতান্তই বাস্তব-বাদী। মূলত Histoire (ইস্তোয়ার) পড়তে গিয়ে আমার বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এর কথা মনে হয়েছে। এই উপন্যাসটির বাঙলা অনু-বাদ হলে চমৎকার হয়।

প্রসঙ্গত একটি দুঃখ এই যে, এ বছরও প্রখ্যাত কবি লেওপোল্দ সেদার সঁঘর নোবেল পুরস্কার পেলেন না। ফরাসি ভাষায় এই কবির কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ খুবই সুখ্যাত। এ ছাড়া আরেকজন প্রখ্যাত লেখিকা মার্গারিত ইউরসনারই (Marguerite Yourcenar) বা কবে নোবেল পাবেন? তাঁর Memoirs D'Hadrien (আদ্রিয়েঁর স্মৃতিকথা) একটি অনন্যসাধারণ উপন্যাস।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

ওলে হ্যানসন

বাণিজ্যের পৃথিবীতে ওষুধের সঙ্গে মানবতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। শারীরিক কষ্টের উপশমের জন্য যে ওষুধ, সেই প্রাণভ্রমরটি বহুজাতিক কোম্পানির লাভ-ক্ষতির হিসেবে বন্দী। অন্যদিকে, যে আধুনিকতায় আমাদের দিন-রাত্রি সম্পৃক্ত, এই লাভ-ক্ষতির অঙ্কই একমাত্র পারে তার ধমনীকে সচল রাখতে। কিন্তু এইসব ওষুধ-কারবারিরা আজ ওষুধ বিক্রিই শুধু করে না, ওষুধ কিনবার এক সামাজিক মানসিকতাও আজ তারা গড়ে তোলে তাদের বাজারের সপক্ষে। কোটি-কোটি টাকা বিনিয়োগ করে, ডাকতার, রাষ্ট্র-নায়ক আর ওষুধ কোম্পানির কর্তারা যৌথভাবে গড়ে তুলেছে এক অদৃশ্য সাইনবোর্ডহীন সংগঠন। এই সং-গঠনের কোনো নাম নেই, কোনো ঠিকানা নেই। কেবল ওষুধ-ব্যবসায়ী-দের জাবদা খাতায় লাভের অঙ্কের ক্রমাগত স্ফীতিই এই সংগঠনের শ্রী এবং স্বাস্থ্য বৃদ্ধির একমাত্র সূচক।

কিন্তু শুধু এই পরিসীমাতেই বাণিজ্য আবদ্ধ থাকে নি। একদিকে যেমন নিবিড়ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হল অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বিক্রির জাল, অন্যদিকে তেমনি ওষুধ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য গোপন রেখে, অসুস্থ মানুষের মুখে তুলে দেওয়া হল শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক ওষুধ। সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাওয়া, আজীবন ব্যাধির শিকার হওয়া, মৃত্যু—সবই ঘটে যেতে থাকল নিয়মিত-ভাবে। আর এই সবকিছুর বিপক্ষে পৃথিবীর মানুষের প্রথম প্রতিনিধি ডাকতার ওলে হ্যানসন।

পেডিয়াট্রিক নিউরোলজির এই অধ্যাপক সুইডেন তোলপাড় করে তুলেছিলেন, সুইডেনের বহুজাতিক দানব সিবা-গাইগির বিরুদ্ধে বিবেকের লড়াই শুরু করবার পর। সেটা ছিল ১৯৬৫ সাল। ডাকতার হ্যানসন পৃথি-বীর মানুষকে জানিয়ে দিলেন, ক্লিও-কুইনল (যা আমাদের দেশে মেকসা-ফরম নামে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়) এবং 'স্মন'—এই দুটো জিনিস প্রত্যক্ষ-ভাবে সংযুক্ত। স্মন-এর পুরো নাম, সাব অ্যাকিউট মায়েলো অপটিক নিউ-রোপ্যাথি। এটা এমন এক ধরনের অসুখ যা রোগীর শরীরে একবার পাকাপাকিভাবে বাসা বাঁধলে সারা জীবন তার ক্ষত বয়ে বেড়াতে হবে। জাপানের টোকিও শহরে স্মন রোগী-দের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটা যখন আদালত পর্যন্ত গড়াল, ডাকতার হ্যানসন তখন এগিয়ে এলেন রোগী-দের সমর্থনে। টানা আট বছর ধরে

চলল মামলা। জাপানের বিজ্ঞানী এবং ডাকতাররা যাঁরা সিবা-গাইগির মতো একটি মালটিন্যাশনালের হয়ে ক্রমাগত ঘোষণা করে যাচ্ছিলেন—স্মন একটি ভাইরাসঘটিত অসুখ, এবং এটা জীনের মাধ্যমে এক মানুষের শরীর থেকে অন্য-এক মানুষের শরীরে আক্রমণ চালায়, এই প্রতিষ্ঠিত অথচ মিথ্যা তত্ত্বকে তছনছ করে ডাকতার হ্যানসন আদালতে প্রমাণ করেছিলেন, সিবা-গাইগির তৈরি ক্লিওকুইনল ওষুধই এই ব্যাধির একমাত্র কারণ। আট বছর পর আদালত রায় দিল ডাকতার হ্যানসন এবং রোগীদের পক্ষে। অবশ্যই এই বিজয়ের জন্য অসাধারণ সমর্থন এসেছিল জাপানের কিছু আইনজীবী এবং জাপানের সংবাদপত্রগুলো থেকে। আর এই আপাত-অসম যুদ্ধই ১৯৭১ সালে জাপান সরকারকে বাধ্য করে সিবা-গাইগির তৈরি ক্লিওকুইনল (অর্থাৎ মেকসাফরম) ওষুধটিকে জাপানে তৈরি এবং বিক্রি নিষিদ্ধ করতে। এ-ভাবেই প্রথম, মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ—এই প্রশ্নটিকে পৃথিবীর মানুষের বিবেকের কাছে হাজির করলেন হ্যানসন। রোগ নিয়ে ব্যাবসার বিরুদ্ধে ওষুধ আন্দোলনের বা ড্রাগ মুভমেনটের যাত্রা হল শুরু।

হ্যানসন কিন্তু এখানেই থামলেন না। এবারে তিনি চোখ ফেরালেন তৃতীয় দুনিয়ার দিকে। নানাভাবে প্রচার চালানোর চেষ্টা শুরু হল যাতে সিবা-গাইগি তৃতীয় বিশ্বে মেকসাফরম এবং এনটারোভায়োফরম নামের ওষুধ বিক্রি বন্ধ করে। এটা ১৯৭৬ সালের কথা। সিবা-গাইগি জাপানের বাজার নষ্ট হবার পর আরও বেশি-বেশি এই ওষুধগুলো তৃতীয় বিশ্বের গরিব-দেশগুলোতে পাঠাতে শুরু করে। অন্যদিকে এইসব গরিব দেশ-গুলোতে অশুদ্ধ জল ব্যবহারের জন্য নানান ধরনের পেটের রোগ হয়ে থাকে, এবং এখানকার লোকজনেরা ডাকতারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া এই ওষুধগুলো ব্যবহার করতে অভ্যস্ত।

সিবা-গাইগির তরফ থেকে গরিব দেশ-গুলোতে এই দুটো ওষুধ বিক্রি বন্ধ করার কোনোরকম ইচ্ছে বা চেষ্টার প্রকাশ না দেখতে পেয়ে, হ্যানসন অনুরোধ জানালেন ডাকতারদের চেতনার কাছে, "আপনারা সিবা-গাইগির কোনো ওষুধ প্রেসক্রিপশন করবেন না।" সুইডেন, ডেনমারক এবং নরওয়ের ডাকতারদের থেকে দারুণ সাড়া পাওয়া গেল। এ ছাড়াও অসংখ্য সমাজসচেতন ডাকতার (ভারতবর্ষে নয়) এই ডাকে সাড়া দিলেন। মেডিক্যাল জারনালগুলো এবং কিছু সংবাদপত্র থেকেও এল সমর্থন। দেখা গেল, ১৯৮১ সালে কেবল সুইডেনের বাজারে সিবা-গাইগির বিক্রি ২৫% পড়ে গেছে। ১৯৮২ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ৩৩% ভাগে। নীরবে চলতে লাগল 'বয়কট সিবা-গাইগি' আন্দোলন। সিবা-গাইগি বাধ্য হল ওষুধ দুটোর উৎপাদন বন্ধ করে দিতে। উল্লেখ্য, এ বছরের মাঝামাঝি থেকে আমাদের দেশেও এই ওষুধ দুটোর উৎপাদন সিবা-গাইগি বন্ধ করে দিয়েছে। যদিও কলকাতার বেশিরভাগ দোকানেই এখনও প্রায় দ্বিগুণ দামে মেকসাফরম কিনতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ডাকতাররা যৌথভাবে এখনও সরকারের কাজে এই ওষুধের বিক্রির বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নি, এবং সরকারের তরফ থেকেও কোনো বাধা-নিষেধ আরোপিত হয় নি। শুধু তাই নয়, আমাদের ড্রাগ পলিসি কনট্রোলের তালিকায় এই ওষুধটি এখনও জীবন-দায়ী (লাইফসেভিঙ) ওষুধ হিসেবে চিহ্নিত।

জাপানের রোগীরা, যাঁরা সিবা-গাইগি থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন তাঁরা সেই অর্থের একাংশ সরিয়ে রেখে একটি তহবিলের জন্ম দিলেন। ভবিষ্যতে পৃথিবীর কোথাও ক্ষতি-কারক ওষুধের শিকার হয়েছেন এমন ব্যক্তিকে আদালতে লড়াইয়ে আর্থিক সহযোগিতার জন্যই এই সঞ্চয়।

প্রাথমিক দুটো যুদ্ধ জয়ের পর হ্যানসন তৃতীয় যে ওষুধটির বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করলেন তার নাম টেনডা-রিল। এটা আমাদের দেশে এখনও সুগানরিল নামে কিনতে পাওয়া যায়। ঘটনাচক্রে এই ওষুধটিরও উৎপাদক সিবা-গাইগি। ১৯৮৪ সালে সিবা-গাইগির নিজস্ব তথ্য এবং তাদের গোপন গবেষণার রিপোর্টকেই ডাকতার হ্যানসন ব্যবহার করলেন প্রমাণ হিসেবে। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, সুইডেনে কয়েকটি অ্যাগ্রোনিউলোমাইটোসিস-ঘটিত মৃত্যুর কারণ টেনডারিল। এতই নিখুঁতভাবে সমস্তকিছু প্রমাণ করেছিলেন হ্যানসন যে সিবা-গাইগি কিছু-দিনের মধ্যেই ঘোষণা করতে বাধ্য হল ১৯৮৬-র মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে তাঁরা ঐ ওষুধটির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবেন। স্পনডিলাইটিস ধরনের কয়েকটি বিশেষ অসুখ ছাড়া অন্য-সমস্ত ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ক্ষতিকারক।

ওষুধ-আন্দোলনে বিশ্বের প্রথম বিদ্রোহী ডাকতার ওলে হ্যানসন ১৯৮৪ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হন। টেনডারিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি যখন ভয়ংকর রকম ব্যস্ত, ঠিক তখনই এটা ধরা পড়ে। এ বছর মে মাসের ২৩ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুভাশিষ মৈত্র

বাংলাদেশ টিভি-র উপহার

কিছু দিন আগে বাংলাদেশ টেলি-ভিশন দুটি নাটক একসঙ্গে ধারাবাহিক-ভাবে প্রচার করছিল, প্রত্যেকটি এক সপ্তাহ অন্তর-অন্তর। একটির নাম 'ঢাকায় থাকি', আরেকটি, 'এইসব দিন-রাত্রি'। আন্তর্জাতিক সীমানার এপারে যাঁদের বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনু-ষ্ঠান দেখার সুযোগ আছে, তাঁদের কারো-কারো মুখে ওই নাটক দুটির প্রশংসা শোনা গেছে। কলকাতার "স্টেটসম্যান" পত্রিকাতেও একবার 'ঢাকায় থাকি' এবং 'এইসব দিন-রাত্রি'র সপ্রশংস উল্লেখ দেখেছিলাম, মনে পড়ছে। তবু, বলা যায়, বাঙালির ঘর-সংসারের সুখ-দুঃখ নিয়ে গড়া ওই যে দুটি নাটক মাসের পর মাস টেলি-ভিশনের কাঁচের পরদাখানিকে সপ্তাহে একবার করে জীবনের অভ্রান্ত আয়নায় রূপান্তরিত করত, পশ্চিমবঙ্গে তার খবর অতি অল্প লোকের কাছেই পৌঁছেছে। সীমানার এপারে ওপারে —দুপারেই আমরা বাঙালি। বাংলাদেশ টেলিভিশনে নাটক যদি শক্তিতে, সৌন্দর্যে অসাধারণ হয়ে ওঠে, সেও আমাদের ঘরেরই খবর। অন্তত হওয়া উচিত ছিল তাই। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক এমন দাঁড়িয়েছে যেন আমরা কেউ কাউকে চিনিই না, আত্মীয়তা তো দূরের কথা। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির একটা প্রাচীর আগে থেকেই ছিল। এখন হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মুসলমানপ্রধান বাংলাদেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের, কিংবা বলা উচিত সম্পর্ক-হীনতার দুস্তর বাধা।

এই কথা ভেবেই বুকের মধ্যে বিশেষ ধরনের একটা বেদনা বোধ করি 'ঢাকায় থাকি' কিংবা 'এইসব দিন-রাত্রি' দেখবার সময়ে, যার সঙ্গে নাট-কের সুখদুঃখের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। যখন দেখি 'এইসব দিনরাত্রি'র স্বল্পবাক শফিকের হৃৎস্পন্দনের আওয়াজ আমি আমার বুকের ভেতর শুনতে পাচ্ছি, তখন কী রকম একটা টনটনানি বুকের কোথায় যেন লাগে। হায়, আমরা কেউ কাউকে চিনি না। অথচ ও আমার পরম আত্মীয়। কিংবা ধরুন নিলোফারের কথা—শফিকের স্ত্রী নীলু। বাড়ির বড়ো বউ, সংসার-চক্রের সেই কেন্দ্রবিন্দু, নাটকেরও সেই কেন্দ্রীয় চরিত্র। পরমার মতো নয়, সাধারণ মধ্যবিত্তের গৃহিণী, টাকাকড়ির কথা ভাবতে হয়, বদমেজাজি শ্বাশুড়ি-কে ঠান্ডা রাখতে হয়, অভিমানিনী ননদ বাপের বাড়ি এলে তার অভিমান সামলাতে হয়, খামখেয়ালি বেহিসেবি দেওর এবং তার স্ত্রীকে শান্ত করে তাদের দাম্পত্য জীবনটাকে পাগলামির ঝাপটা হাওয়া থেকে বাঁচাতে হয়। স্বামীর নির্বাক বেদনার বিপুল ভার-টাও তাকেই বহন করতে হয়। তার ওপর, দশ দিক অন্ধকার করে নেমে এল এক চরম দুর্ভাগ্যের দিন, ছোট্ট মেয়ে টুনির অসুখ, চিকিৎসার জন্যে বিদেশযাত্রা, অবশেষে কালো মেঘের বুক চিরে ঝলসে উঠল চূড়ান্ত দুঃ-সংবাদ। সে বেচারির আর অবকাশ কোথায়, "সেতার বাজাতাম," "কবিতা পড়তাম" ইত্যাদি প্রকারের হাহুতাশে সময় কাটাবার? এখন, সেই যে নিলোফার—বুদ্ধিতে, বিবেচনাশক্তিতে, ব্যক্তিত্বে, স্নেহেমমতায়, মাধুর্যে যে অপার-ঐশ্বর্যশালিনী, অথচ যে একান্ত-ভাবেই আমাদের আপনার জন, যার চাপা দীর্ঘশ্বাস আমার বুকের ভেতর যেন গুমরে ওঠে, হায়, সেও তো আমার কেউ নয়!

দুটি নাটকের মধ্যে 'এইসব দিন-রাত্রি'র কথাই বিশেষ করে বলছি, তার একটা কারণ 'ঢাকায় থাকি' আমার আগাগোড়া দেখবার সুযোগ হয় নি। তা ছাড়া যদিও 'ঢাকায় থাকি'-তে পারিবারিক এবং সামাজিক নানা সম্পর্কের এবং মনের নানা ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ার জটিলতার সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয়ের হয়তো সুযোগ ছিল, তবু 'দিনরাত্রি'ই আমার দিনরাত্রিকে বেশি করে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বলতে লজ্জা নেই, আমরা যারা প্রশিক্ষিত নাট্যসমালোচক নই, তারা 'দিনরাত্রি'-র নানা চরিত্র, এবং তাদের সুখ-দুঃখ থেকে প্রয়োজনীয় মানসিক দূরত্ব বজায় রাখতে অক্ষম হয়েছি। মায়াবদ্ধ জীব আমরা, কল্পনাকে বাস্তবের অধিক সত্য বলে ভুল করেছি। তৃপ্ত হয়েছি ছোটো বউ শরমিনের বাবার শোভন সহৃদয়তায়, প্রীত হয়েছি বোন সাহানার প্রিয়দর্শন স্বামীর সহজ সমবেদনার গভীরতায়, ভীত হয়েছি বড়ো ভাই শফিকের নিদারুণ আত্মিক সংকটে, অসহায় বোধ করেছি নিলো-ফারের অসহায়তায়। তারপর এক দিন গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে রাতে শুতে গেছি, জারমানি থেকে টুনির কী খবর আসে। তারপর আমাদেরই বিশ্বসংসার খান-খান হয়ে ভেঙে পড়তে দেখেছি, যখন টেলিফোনে শেষ খবরটি এল, যখন সাহানার স্বামীর প্রিয়দর্শন মুখাবয়বে এক মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম, তার মার্জিত সুসভ্য কণ্ঠস্বরে এক মুহূর্তের মধ্যে ধ্বনিত হতে শুনলাম, মহাজাগতিক ধ্বংস। এই অভিনেতার নাম জানি না, লিখে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু যে চরিত্রটি তিনি গড়ে তুলেছেন, তার চেয়ে গভীর, অথচ সহজ, কোনো চরিত্র কোনো নাটকে কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।

আসলে, সারা নাটকটিতে অগভীর কিছু, গণ্ডূষমাত্র জলে কোনো শফরীর ফরফরানি দেখি নি। এর কাহিনীর শিকড় চলে গেছে অস্তিত্বের গভীর প্রদেশে, এর প্রত্যেকটি চরিত্রের ইতি-হাস, তার আশানিরাশার, আনন্দ-বেদনার অনেক দিনরাত্রি, নাটক যেখানে শুরু তার পেছনে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত। কারা এরা? সংক্ষেপে তাদের একটু পরিচয় দিই।

দুই ভাই শফিক এবং রফিক, এবং বোন সাহানা, দুই ভাইয়ের দুই স্ত্রী নিলোফার এবং শরমিন, বাবা-মা, রফিক-শফিকের ছোট্ট মেয়ে টুনি। নাটকের কেন্দ্রে এঁরাই। তা ছাড়া

আছেন সাহানার স্বামী এবং শরমিনের বাবা, ম্যাজিসিয়ান আনিসুর, যার প্রতি সাহানা বিয়ের আগে আকৃষ্ট হয়েছিল, আছে সাদেক আলি যাকে কাছে আসতে দিলেও বিপদ, কী করে বসবে তার ঠিক নেই, আবার দূরেও রাখা যায় না, এমনই তার অকপট অনৈতিকতার আকর্ষণ। সবশেষে যাঁর নাম করব বাঙলা সাহিত্যে, বাঙলা নাটকে, কোথাও আমি তাঁর জুড়ি পাই নি। শফিক-রফিকের কবীরমামা! ইস্কুল মাসটার ছিলেন, রিটায়ার করে এখন 'আদর্শ নীলগঞ্জ' গ্রাম গড়তে মরণপণ করেছেন। যখন-তখন সতরঞ্চিতে বিছানা বালিশ জড়িয়ে নিয়ে শফিকদের বাড়িতে উদয় হয়ে থাকেন, বেড়াবার জন্যে নয়, সাহায্যের সন্ধানে। তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারছি না। কোনো এক পুরোন ছাত্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, আদর্শ নীলগঞ্জে ইস্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্যে সাহায্যের প্রত্যাশায়। ছাত্র এখন মস্ত বড়ো সরকারি অফিসার। সন্ধ্যাবেলায় কবীরমামা বাড়ি ফিরে এলেন—শ্রান্ত, অবসন্ন। শফিকের বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?" মাথা নেড়ে বললেন, "কিছুই দেবে না। বললে, 'দেখুন স্যার, এসব কাজ প্রাইভেট সেকটারে করা সম্ভব নয়।'" শফিকের বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তাকে কী বললেন?" কবীরমামা ক্লান্ত গলায় বললেন, "কী আর বলব? বললাম, 'বাবা রহমান, তুমি ছাত্রজীবনে যেমন গোরু ছিলে, আজও তেমনি গোরু আছ।'"

বেঁটেখাটো, শক্তসমর্থ গড়ন, একমুখ পাকা দাড়ি—এই কবীরমামার পার্ট কে করেছেন তাঁর নামও জানি না। কিন্তু তাঁর চেয়ে জীবন্ত, তাঁর চেয়ে সত্যবস্তুতে গড়া, তাঁর চেয়ে সত্যিকারের রক্তমাংসের কোনো মানুষের সাক্ষাৎ বাস্তব জীবনে কখনও পাবার আশা করি না।

হুমায়ুন আহমেদের লেখা নাটক, মুসতাফিজুর রহমানের নির্দেশনা। যেমন নাটক অসাধারণ ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ, তেমনি নির্দেশনা অভ্রান্ত, দৃঢ় অথচ সংবেদনশীল। আর অভিনয়? নিলোফারের কথা আগেই বলেছি। ডলি জহরের মৃদুতম অভিব্যক্তি অতলস্পর্শী—অনুভূতিকে দর্শকের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। বুলবুল আহমেদের শফিক একের পর এক জানালা খুলে দিয়েছে দর্শকের চোখের সামনে, "না-বলা বাণীর ঘন যামিনী" অধিকার করেছে দর্শকের চিত্তকে। আসাদুজ্জামান নূর রফিকের চরিত্রটিকে দিয়েছেন এমন বাস্তব অস্তিত্ব, যাকে অস্বীকার করতে গেলে জীবনকেই অস্বীকার করতে হয়। লুৎফুন্নাহার লতার শরমিন, তার অভিমান, তার মমতা, তার সৌন্দর্য দিয়ে দর্শকের জীবনের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে।

কার কথা বলব? কাকে বাদ দেব? রফিক-শফিকের মা? আত্মভোলা, অপটু, অসাংসারিক স্বামীর সঙ্গে তাঁর সারা বিবাহিত জীবনের ইতিহাস তাঁর কথার সুরে, তাঁর গলার স্বরে, তাঁর ভাবেভঙ্গিতে নির্ভুলভাবে প্রকাশিত। তাঁকে অপছন্দ করেছি অনেক সময়ে, কিন্তু অস্বীকার করতে পারি নি এক মুহূর্তের জন্যেও।

সমস্ত নাটকখানিই এমন অমোঘ সত্যের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে, যে স্বীকার-অস্বীকারের প্রশ্নই ওঠে নি যতক্ষণ নাটক দেখেছি। পরে যদি কারো মনে এ প্রশ্ন জেগে থাকে, এই যে স্নেহে-মমতায়, প্রেমে-ভালোবাসায়, উদারতায় সহৃদয়তায় গড়া নাটক, এরকমই কি আমাদের জীবন? তখন স্বীকার করতেই হয়, জীবনে হিংসা-দ্বেষ-স্বার্থপরতা, কুটিলতা, নির্মম উদাসীন কাঠিন্য আছে। এ নাটকেও যে একদম তার উঁকিঝুঁকি নেই, তা নয়। তবু এমন মানুষের পৃথিবীতে এখনও অভাব নেই যাদের দেখলে সংসারে বাঁচতে ইচ্ছে করে।

না হয় তাদের নিয়েই আনন্দমধুর, বেদনামধুর একটি নাটক হল। তাতেই বা ক্ষতি কী?

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক মারাঠি কবিতা

ডানদিকে পিঠ ফিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে একটি নগ্নদেহ নারী, তার গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে ফুলসমেত একটি চারাগাছ, আর সেই চারাগাছের মাথায় এক বীভৎস কঙ্কালমুণ্ড : একটি কবিতাসংকলনের প্রচ্ছদপত্রে আঁকা একটি ছবি। বোমবাই পৌরসভার অন্তর্গত চিকিৎসাকেন্দ্রে যৌনব্যাধিগ্রস্তদের যে-ছাপানো কাগজে বিশদ বিবরণ লিখে দিতে হয়, তারই প্রতিলিপির উপরে এই প্রচ্ছদচিত্রটি। কবিতা-সংকলনটির নাম 'গোলপিঠা'। গোলপিঠা বোমবাইয়ের একটি গণিকাপল্লী। তরুণ কবি নামদেব ধসাড় 'গোলপিঠা' কাব্যগ্রন্থে এই অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত করেছেন। শব্দ, উপমা, অনুষঙ্গ ব্যবহারে এই অঞ্চলটি কাব্যগ্রন্থটিতে বিশ্বস্ত এবং আন্তরিক ভাবে উপস্থিত।

সাম্প্রতিক মারাঠি কবিতার ক্ষেত্রে নামদেব ধসাড়ের নাম স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মহারাষ্ট্রের 'দলিত প্যানথার' আন্দোলনের তিনি এক অগ্রগণ্য নেতা।

সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের নিপীড়িত মানুষেরা মহারাষ্ট্রে 'দলিত প্যানথার' নামে পরিচিত এবং তাদের নিয়ে রচিত সাহিত্যকে বলা হয় 'দলিত সাহিত্য'। সাধারণত যেসব বিষয়কে অশ্লীল বলা হয়, সে সবকিছুই এঁরা সংস্কারহীন চিত্তে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেছেন। বিজয় তেনডুলকরের 'সখারাম বাইনডার' নাটকটি এই ধারারই অন্তর্গত। বক্তব্য বিষয় এবং অশ্লীলতার অভিযোগে গ্রন্থটিকে নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তা মারাঠি সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত তথা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজভিত্তিকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। এর আগে আর কোনো গ্রন্থকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত বিতর্কে এত বেশি মারাঠি লেখক কখনও যোগদান করেন নি।

দলিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে অগ্রণী তরুণ কবিদের মধ্যে নামদেব ধসাড়ের নামটি উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত। চিরাচরিত প্রকাশভঙ্গি থেকে মারাঠি কবিতাকে নামদেব ধসাড়ের মতো কবিরা মুক্তি দিয়েছেন। সমাজের অনগ্রসর শ্রেণী থেকে এঁরা এসেছেন। দলিত প্যানথাররা মারাঠি সাহিত্যের মতো মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু এঁদের রচিত কবিতাই আগে মনোযোগ আকর্ষণ করে—রাজনৈতিক প্রতিপত্তির কথা পরবর্তী স্তরে।

নামদেবের কবিতায় সামাজিক বৈষম্যের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ—সে প্রতিবাদের ভাষা অশ্রুতপূর্ব, উচ্চকণ্ঠ, কখনও-কখনও, হয়তো-বা রুচিবিগর্হিত, পূর্ববর্তী মধ্যবিত্ত-মানসিকতা-জাত মোলায়েম কাব্যধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কবিতার ভাষা যুগপৎ অমার্জিত এবং সৎ। 'রাস্তার কিনারে' কবিতাটিতে নামদেবের প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ সোচ্চার—

রাস্তার কিনারে-কিনারে জমে-ওঠা জনজালের স্তূপ/তেমনি জমা দুঃখ আমাদের জীবনে।/কেটে ছেঁটে যেন পোকামাকড়ের সমগোত্রী।/মার গর্ভ থেকে/রাম নাম সত্ হ্যায়—এর সীমানা পর্যন্ত/পূর্ব পশ্চিম আনাগোনার ফাঁকে/জীর্ণ ছাউনিতে তালি লাগাতেই ব্যস্ত।/এক ঠিকানা থেকে আর-এক ঠিকানায় যেতে/পিঠের ওপর এবড়ো-খেবড়ো ক্ষতরেখাই বেড়ে চলে।/সকাল সন্ধ্যা/জড়ো-করা জনজালের মধ্যে থেকে খুঁটে-খাওয়া অন্ন দিয়ে/এই যে অর্ধনগ্ন দিনযাপনের কাহিনী ;/স্মৃতির রোমন্থনে কোটি কোটি বিছে শিরায় বসায় কামড় ;/পরে রাত্রির অবকাশে/আমাদের এই দুঃসহ অবস্থা নিয়ে/পরীক্ষামূলক রঙ্গমঞ্চে যে ব্যঙ্গ-তামাশার আয়োজন হয় ;/ঈদের ছাগলের মতো যে নিঃশব্দ বলির অনুষ্ঠান ;/এর পরও কি আত্মাকে উদাত্ত করার প্রশ্ন আসে?/মানুষকে যোনির নামে চিহ্নিত করে যারা বাঁচে/তারা ওই আনন্দেই/থাকুক।/আমি কখনই, কখনই ওই জীবনকে মেনে নেব না।*

নামদেব রোমানটিক-আবেগবর্জিত কবি নন। কিন্তু রোমানটিক আবেগের মধ্যেও এক ধরনের নির্মোহ নির্লিপ্ত ঋজু মনোভাব তাঁর কবিতাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মন্দাকিনী পাটিল যে কোলাজ আমার মনে' কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি—

ক্যানভাসে নীল রঙ/পরিধেয় ছিন্নভিন্ন, জানু ব্যবচ্ছিন্ন, এক ষোলো বছরের মেয়ের উঠেছে খিঁচুনি/

এই আয়োজন/মানবদেহের বিচিত্র ভূগোলকে উপাসনা করার জন্যে/এবং রক্তমাংসের রোমানটিক খেলাকে পুজো করার জন্যে।

মন্দা/তোমার মন নয় ছাই, নয় মার্বেল পাথর/আমি অনুভব করি তোমার চুল, তোমার বসন,/নেতামার আঙুলের নখ,/
তোমার স্তন

ভালোবাসার রমণী পবিত্র বেশ্যা/প্রেমিক তার শুদ্ধীকৃত দালাল/স্ত্রীলোকেরা ছাপানো গণিকা পুরুষদের/পুরুষেরা দালাল মেয়েমানুষদের/নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক/কতকগুলি বারাঙ্গনা, একদল কোটনা/একগোছা পুরনো টুথব্রাশ/ব্যবহার করে থুথুর সঙ্গে ফেলে দাও/গঙ্গাজলে কুলকুচা করে।

মন্দা/ও আমার ময়ূরী......

মারাঠি কবিতার মোড় ফিরেছিল চল্লিশ দশকের শেষ দিকে। সমাজসচেতনতা এই সময়ের কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ। এ পর্যায়ে উল্লেখ্য কবি বালকৃষ্ণ সীতারাম মারধেকর। তাঁর কবিতায় সর্বপ্রথম আধুনিক জীবনযন্ত্রণার কথা আভাসিত। তিনি বাকপ্রতিমার কণ্ঠে দুলিয়েছেন নিষিদ্ধ জগতের শব্দমালা। 'শিশিরাগম' কাব্যে সৌন্দর্যের পথে তাঁর পদচারণা, কিন্তু পরবর্তী কাব্যে "কহি"-তে যন্ত্রসভ্যতার কঠিন রাজ্যে নিপীড়িত মানুষের বেদনা বাঙ্ময়। মারধেকরের কাব্যের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিল অশ্লীল-অশালীনতার অভিযোগ। মারধেকরের প্রগাঢ় অনুভব নতুন চিত্রকল্প আর যুক্তিবাদী মননশীলতা নতুনতর কবিগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করেছে।

মারধেকরের পর যে কবি বিশিষ্টতায় চিহ্নিত তিনি পি. এস. রেগে। শব্দসচেতন এই কবির রচনায় তপ্ত কামনার আরক্তিম অনুভব।

চল্লিশ দশকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন বসন্ত সাভান্ত আর মঙ্গেশ পাদগাঁওকর।

পঞ্চাশের দশকে মারাঠি কবিতায় নবচেতনা সঞ্চারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন বিন্দা কারান্দিকর। পরিবর্তনশীল সমাজের চ্যালেনজের মুখোমুখি হবার জন্যে নিয়ত পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কাব্যসৃষ্টির অব্যাহত প্রয়াসে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। এইজন্যেই কারান্দিকরের কবিতা নতুন টেকনিকে, নতুন শিল্পকৌশলে অভিনব। রোম্যানটিক ভাবাবেগের মধ্যেও তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছে সমসাময়িক জীবনের যন্ত্রণা, সর্বহারাদের প্রতি সহানুভূতি তাঁর 'অভিশাপ' কবিতাটিকে এক নতুন দ্যোতনা দিয়েছে—

* মারাঠি লেখক শ্রীমাধব পাধির সহায়তায় শ্রীঅসীম চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ভাষান্তরিত। যথাবিহিত সৌজন্যস্বীকার।

যেমন আমি মনে করি/তোমার চোখ,/ আমার চোখ ভরে যায়/বৃথা অশ্রুজলে,/ এবং ভোরের জোনাকি/তোমার চুলের মধ্যে করে/বারবার যাওয়া-আসা।/

এই ভাবেই দিন কাটে/এই ভাবেই রাত হোঁচট খায়,/তা হলেও আমার ঘরের চৌকাঠে/জমে-থাকা মাটির পাহাড় শেষ হয় না।

এবং আমার ঘরের দরজা কখনও ভেঙে পড়ে না,/হয়তো/এটাই সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ/কোনো পাপ করতে না পেরেও একজন পাপী হওয়া॥

ষাটের দশকে দিলীপ চিত্রে মারাঠি কবিতায় মানবমনের জটিলতাকে বিপুল পটভূমিকায় প্রসৃত করে অপরিসীম গভীরতা দান করেছেন। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন দিলীপ। এই পরিভ্রমণও তাঁর কবিতাকে বিস্তৃতি দান করেছে, এনেছে নতুন স্বাদ। তাঁর স্বচ্ছ কবি-দৃষ্টিতে আমেরিকা আর ভারতবর্ষের কয়েকটি মৌল পার্থক্য বিভাসিত হয়েছে 'স্বেচ্ছানির্বাসনে' কবিতায়—

মৌসুমের প্রথম মৃত প্রজাপতি/নতুন করে পাখা খুইয়েছে। ঘাসের শিশির/যেমন জুতোর কাছে তেমনি অর্থগুলি/স্থানান্তরিত। আমেরিকা বিস্ময়কর প্রেমোদ্দীপক।/অনেক পায়ের সমাহার রাস্তাগুলিকে করেছে সেকসি।/ঘরে ফিরে বসবেতে আমাদের একটাই হাজার পায়ের কেন্নো/প্রতি ভোরে শহরের দিকে ভ্রমণ করে।/সেখানে এত গরম, তাহলেও ভদ্রতা-রক্ষার জন্যে/যার যত পোশাক আছে পরে নেয়।/সেখানে যাদের টাকা আছে পেট ভরে যত পারে/খেয়ে নেয়, একদম এখানকার মতো নয়, ক্যালোরির কথা না-ভেবে।/ঘরের কথা আমার খুব মনে পড়ে। আমি একটা অপদার্থ।/উজ্জ্বল গৌরবে ফেরার সুনাম কোনোদিন আমার ছিল না,/নয় যে আমেরিকা সুন্দরী নয়, আমি ভীত/এদের বিচ্ছুরিত যৌবনদ্যুতিতে, এমন অনাবিল সারল্য,/বাকি পৃথিবীর এমন অপরূপ প্রেমাক্রান্ত দৃশ্য,/যা কোথাও আছে/যাতে আমাকে নিষ্প্রয়োজন মনে হয়/আমেরিকান নই বলে।/সম্ভবত আমার হওয়া উচিত ছিল, অন্তত, একজন গুরু,/অথবা এক যোগী বা ধনী মহিলার ভাড়াটে নৃত্যসঙ্গী সাপুড়ে বা পাচক/যে পারে সংগোপন উপাদেয় আহার্য বানাতে, কবি হবার চেয়ে।/আমেরিকা, তোমাদের দেশে, আমি এসেছি/অনেক দেরিতে।

সহজাত আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব, সংবেদনা আর স্মৃতির মিশ্র অনুভূতি অনিরুদ্ধ কুলকার্ণির কবিতার মূলে ক্রিয়াশীল। তাঁর কবিতার শরীর-শিল্প নমনীয়, মহার্ঘ্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং গভীর। কাব্যবস্তু সাধারণত দুটি মেরুতে সঞ্চরণশীল—নিয়তি এবং পুরস্কার। কিন্তু এই নিয়তি বা অদৃষ্ট এক অন্ধকার পাথরের প্রাচীর নয়, বরং চোখের পলক ফেলার মতো সূক্ষ্ম এবং অনিত্য ; আর পুরস্কার—সত্তার মাধ্যমে অন্তহীন অভিজ্ঞতার পথে অভিযাত্রা।

নগ্নতার গভীরে প্রবেশের অভীপ্সা সতীশ কালসেকরের 'ইন্দ্রিয়োপনিষদ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে। মর্মমন্দির অভিমুখে কবির যাত্রাপথ শেষ হয়েছে দেহমূলে। এক ধরনের দার্শনিকতা-সঞ্জাত ভীতি-অনুভব, গভীর অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই, অনেকাংশে দিলীপ চিত্রের মতো, বিমূর্ত বাকধারায় অবসিত।

অরুণ কোলাটকর মারাঠি সাহিত্যে এক উজ্জ্বল-চিহ্নিত নাম। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জেজুরি' 'কমনওয়েলথ পোয়েট্রি অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছে। অমেয় খ্যাতির অধিকারী এই কবি আপন ভাব প্রকাশে অকুণ্ঠ। জীবনের অন্ধকার আর অচলিত পথেই তাঁর পদচারণ সমধিক। তরুণ মারাঠি কবিদের উপর কোলাটকরের উল্লেখনীয় প্রভাব। তাঁর 'পুরোহিত' কবিতায় সংস্কারহীন তীক্ষ্ণ, তির্যক ব্যঙ্গের দ্বিধাহীন প্রকাশ—

কালভার্ট দেয়ালের পাশে ঠান্ডা পুরনো মন্দিরে/নতজানু প্রার্থনায়/পুরোহিত অপেক্ষা করে।

আজ কি তীর্থযাত্রী-বাস দেরিতে আসবে?/পুরোহিত মনে ভাবে—কী দান পড়বে দেবতার থালায়?

বসে-থাকা পুরোহিতের অন্ডকোষ দ্রুত ভিতরে ঢোকে/পুরনো মন্দিরের কর্কশ পাথরের আঁচড়ে/উঠে দাঁড়ায় সূর্যের দিকে মুখ রেখে।

এবং তাকায় দৃষ্টি সীমানার বাইরে রাস্তার দিকে/মৃত মানুষের কররেখার মতো/ঘটনাহীন বিবর্ণতায়।

পুরোহিতের মাথায় সূর্যের স্পর্শ/গালে সূর্যের হাত/গ্রামনাপিতের ঘনিষ্ঠতায়।

পানপাতার বিচ্ছিন্ন টুকরোর সঙ্গে/পুরোহিতের জিহ্বার ভিতরে নড়ে-চড়ে/পুজোর মন্ত্র।

এতে কাজ হয়।/বাসটি আর পুরোহিতের মাথার মধ্যে শুধু /একটি চিন্তা নয়/দূরে সে এখন একটি বিন্দু।

তার অলস গিরগিটি দৃষ্টির সামনে/বিন্দুটি বড়ো হয়ে ওঠে/নাকের উপরে আবের মতো।

ধাক্কাধাক্কি প্রচন্ড শব্দের মধ্যে/বাসটা পুরোহিতের সামনে গর্ত করে/তার সামনে আঁকা হয় ছবি।

বাসটা এক চক্কর ঘুরে/স্টপেজে দাঁড়িয়ে যায়/বিড়ালের ঘরঘরানির শব্দে পুরোহিতের সামনে।

তার মুখের সামনে একটা শিকারি বেড়াল/তার দাঁতের মধ্যে ধরে থাকা তীর্থযাত্রীদের/গ্রাস করবার ব্যগ্র লালসায় উদগ্রীব।

পারিপার্শ্বিক জীবনের প্রতি শুধুমাত্র তীব্র প্রতিবাদই নয়, কোলাটকরের অকুণ্ঠ প্রকাশভঙ্গির পরিচয় 'মৃত্যুর পাশের ঘর' কবিতায়—

মৃত্যুর পাশে একটি ঘর/শহরের শেষে পথের পাশে একটি হোটেল/দেওয়ালের গায়ে টিকটিকিরা/লিখবে আমার ভবিতব্য/

নির্জীব হোটেলের কামরায়/শহরের পথের শেষে/হাস্যাস্পদ ঘরের কোণে মাকড়শা/হস্তমৈথুনের সাক্ষী :

সেখানে আমি নিজের জন্যেই অপেক্ষা করছি/সেই হতকুচ্ছিত ঘরে/যার দরজা নিজেই উন্মুক্ত হয়/আমার জুতোর শব্দে।

সেই সংকীর্ণ অভাবী ঘরে/শহরের শেষে পথের পাশে হোটেলে/আমি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি/আমার নিজের ভেতরকার বদমাশ বনমানুষটাকে।

সমাজের পিলসুজবাহী একেবারে নীচুতলার বস্তিবাসী মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখবেদনা, কামনাবাসনাকে যাঁরা কাব্যের বিষয়বস্তু করেছিলেন নারায়ণ সুরভে তাঁদের মধ্যে অগ্রণী কবি। নারায়ণ সুরভের 'মাই য়ুনিভারসিটি' কবিতাটি তাঁর রচনার সব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল—

আমার ঘর নেই, নেই স্বজন-পরিজন—/শুধু পায়ের নীচে যতটুকু মাটি ততটাই সম্বল/আমার আশ্রয় দোকানের বারান্দা,/বিনামূল্যে মিউনিসিপ্যালিটির ফুটপাথ,/রাস্তার ল্যামপপোসটগুলি মুখস্থ/দোকানের সাইনবোর্ডের অক্ষরগুলিও।

জীবনের জটিল গণিতের মধ্যে/দিশেহারা এক অস্তিত্ব—

নামদেবের কবিতার মতো নারায়ণের কবিতা-রচনার পশ্চাৎপটে রাজনৈতিক সচেতনতা ক্রিয়াশীল। অন্য ধারার মারাঠি কবিতায় কবিদের অন্তর্লোকের অনুভূতির লাবণ্যময় প্রকাশ। সেখানে বহির্জগতের রাজনৈতিক, সামাজিক, বাস্তব পরিবেশ অনুপস্থিত। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতার আলোকে মারাঠি কবিতাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। নারায়ণ সুরভে-নামদেব-মানসিকতার কবিদের কবিতায় পারিপার্শ্বিক সচেতনতার সঙ্গে বাস্তব জীবনের অকুণ্ঠ নগ্ন প্রকাশ। দ্বিতীয় ধারার কবিতায় জীবনের মনোরম, সূক্ষ্ম, সৌন্দর্যময় আবেগের প্রকাশ। এই দ্বিতীয় ধারার কবিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বসন্ত সাভান্ত সুকোমল সংবেদনশীল ভাব প্রকাশে সুনিপুণ। তাঁর একটি প্রেমের কবিতায়—

তোমার দেহের ছায়া আমাকে ধন্য করে নি/কিন্তু তোমার দেহসৌরভ প্রসাদময়ী,/আমার হৃদয়ে আজ ফুটেছে একটি তারা।/আকাশের চাঁদও ম্লান তার কাছে—

গীতিকবিতা অবশ্যই অন্তর্লীন। মারাঠি কবিরা প্রকৃতির সঙ্গে কবি-মানসের সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন। সেই সঙ্গে রয়েছে তাঁদের অব্যবহিত অভিজ্ঞতা।

কর্মজীবনে কৃষক, কবি এন. ভি. মনোহরের কবিতায় প্রকৃতির মায়াময় গীতল প্রকাশ। এই গীতিময় সুরমাধুর্যের জন্য মনোহরের কবিতা আবৃত্তিশ্রবণ এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

পূর্ববর্তী সময়ে যাঁরা কাব্যরচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে মহিলা-কবি ইন্দিরা এবং পদ্মার নাম অবশ্য স্মর্তব্য। এঁদের কবিতায় মহিলা-সুলভ সুকোমল হৃদয়মাধুর্য। পরবর্তী কালে এই ধারার এক উল্লেখযোগ্য কবি শিরিশ রাই। এই তরুণী কবি ষোড়শ শতাব্দীর সাধিকা কবি মীরাবাঈয়ের আত্মলীন ভাবময়তার কথা মনে পড়িয়ে দেন—

একমুঠো শস্য তুলে দাও আমার করতলে/ খুব বেশি কিছু কি আশা করছি আমি?/সব দ্বিধা-লজ্জা দূরে ফেলে দুহাত প্রসারিত/তোমার করুণা কি নেই? কতটা প্রার্থনা করব?/এই দীন প্রার্থনা কি তোমায় খুশি করবে?/এ দু হাত তো তোমারই অবদান—/এ অঞ্জলি পূর্ণ করা কি তোমারই কর্তব্য নয় বিনা প্রার্থনায়?

অতিরিক্ত আত্মদর্শন কখনও-কখনও মরবিডিটির সীমান্তে মোহগ্রস্ত করে। বসন্ত আবাজী ডাহাকের কবিতায় আত্মসমীক্ষা আত্মপীড়নের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাঁর 'যোগভ্রষ্ট' কবিতাটি—

আমি ঘরে ফিরি প্রবল বিধ্বংসী মানসিকতায়/কোনো কিছুতে আমার আকর্ষণ নেই/আমার অন্তরে আগুনের দাবদাহ/ঘরে-বাইরে গ্রীষ্মের জ্বলন্ত দুপুর,/এবং বাইরে রাক্ষসের চোখ/দিন কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে সূর্য/রক্ত ছড়িয়ে গেল সব জায়গায়,/দমবন্ধ ফুলগুলি ঝরে পড়ল প্রাণহীন/শূন্য রাস্তায় ল্যামপপোসটগুলির মাথা ঝুলে পড়েছে হতাশায়/এবং/যখন আবার আলো জ্বলল/আমি নিজেকে সুরক্ষিত রাখি/স্বপ্নের দুর্ভেদ্য দুর্গে/আত্মতৃপ্ত সজীব-চঞ্চল।/

ডাহাকে এবং ধসাড়ের মধ্যে শব্দ-ব্যবহারে খুব মিল, কিন্তু তাঁদের পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গিতে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়েও ডাহাকে যেন সমাজ থেকে বিবিক্ত। তাই প্রথাসিদ্ধ কাব্য-প্রতীক এবং ভাবময়তাকে বর্জন করলেও তিনি মূলত গীতিকবির সহধর্মী।

তরুণ কবিদের উপরে যে কবি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি গ্রেস। আত্মমগ্ন মরবিডিটি গ্রেসের কবিতায় সমধিক। তাঁর 'সন্ধ্যার কবিতা'—

নদীর পারে তোমায় দেখলুম/খোলাচুল পিঠে ছড়ানো,/অন্ধকারে দীর্ঘ গাছের ছায়া/কুয়াশার প্রাসাদে তোমার পদক্ষেপ/কোনো শব্দ নেই, নেই প্রতিধ্বনি/আকাশের তটে ঘন নীল/আমার আস্তানা তোমার আমার আশ্রয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যাঁরা কবিতা লিখতেন নতুন মারাঠি কবিরা তাঁদের থেকে ভিন্ন। কিন্তু এঁরা সচেতনভাবে বিপ্লবী মনোবৃত্তিতে আচ্ছন্ন নন। যদিও পুঁথির জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পারেন নি—তবু যে প্রতিশ্রুতি তাঁদের কবিতায় তা বিশেষভাবে আশাপ্রদ।

কিরণশঙ্কর মৈত্র